লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭১ বর্ষ ■ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

২৪ কার্তিক, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ■ ১৬ জিলকদ, ১৪২৯ হিজরি

১৫ নবুওত, ১৩৮৭ হিঃ শাঃ ■ ১৫ নভেম্বর, ২০০৮ ঈসাব্দ

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুৎবা

কুরআন আমার প্রিয় কুরআন

ইসলামে খিলাফত

পিছন ফিরে দেখা

জ্ঞান জিজ্ঞাসা

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট ভবন ওয়েস্ট মিনিস্টারে প্রদত্ত সংবর্ধনার জবাবে হুযূর (আই.) ভাষণ প্রদান করছেন

হুযূর (আই.) লর্ড বিশপ নাযির আলী-কে সৌজন্য সাক্ষাৎ দান করছেন

সম্পাদকীয় ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েই চলেছে এসব কিসের আলামত!

পৃথিবীতে আজ একের পর এক প্রাকৃতিক দৈব দুর্যোগ ঘটেই চলেছে যেমন, সুনামীর তান্ডবে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া,জাপান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ হয়েছে লন্ড-ভন্ড।

অতি সম্প্রতি ভূমিকম্পে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে কমপক্ষে ১৭০ জন নিহত হয়েছেন। রিক্টার স্কেলে ৬ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে সেখানে। এতে আহত হয়েছে বহু নর-নারী। ভূমিকম্পের আঘাতে অসংখ্য বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বেঁচে থাকা মানুষগুলো রয়েছে অসহায় অবস্থায়। বাড়িঘর হারিয়ে তাদের দিন কাটছে খোলা আকাশের নিচে। তাদের কাছে খাদ্য নেই, পানি নেই, ঔষধ নেই, নেই গরম কাপড়। গৃহহারা হয়েছে কমপক্ষে ১৫ হাজার মানুষ। দাবানলে জ্বলেছিল আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিঃস্ব অসহায় আফ্রিকা। এইডসের হিংস্র থাবায় ধুকে ধুকে মরছে সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ। জানা-অজানা আতংকে ভীত-বিহ্বল বিশ্ববাসী। এর সাথে যোগ হয়েছে সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সঙ্কট ।

একটু চিন্তা করে দেখবেন কী, এসব দুর্যোগ কেন এত ব্যাপক রূপ ধারণ করছে? কেন একের পর এক বিপদ পৃথিবীতে প্রবল হয়ে আসছে। জগত জুড়ে সংঘটিত এসব আযাবের তান্ডবলীলা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর সতর্ক বাণীরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তিদের না মানলেই তিনি তাঁর রুদ্র মূর্তি প্রকাশ করে এক ভয়ানক আযাবের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি আযাব দিয়ে থাকেন। এ কারণে এই ঐশী ক্রোধ থেকে মুক্তির পথ এবং উত্তরণের মাধ্যম হচ্ছে যুগ ইমামকে মেনে নিয়ে ঐশী খিলাফতের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া।

তাই আমরা জগদ্বাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি, যুগ ইমামকে মেনে নিয়ে অনুতাপকারী হয়ে নিজেরাও হেফাযতে থাকুন আর সমগ্র জগতকেও হেফাযতে রাখুন। সমগ্র পৃথিবীর এসব দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য চাই ঐশী নেতৃত্ব। কেবল ঐশী নেতৃত্বই পারে এসব দুর্যোগ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে। এতো সব ভয়াবহ তান্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেও কি জাতির হুঁশ হয় না?

তদুপরি আজ সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের যে উত্থান তা থেকেও জাতিকে রক্ষা পেতে হবে। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ভারতের আসামে সিরিজ বোমা হামলায় নিহত হয়েছে অনেকেই। আর এমন ঘটনা পাকিস্তানে তো অহরহ হচ্ছেই। এমনই ভাবে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসীদের হাতে সাধারণ জনগণ জিম্মি হয়ে আছে। তাই সকল প্রকারের দুর্যোগ ও সন্ত্রাসের কবল থেকে জাতি রক্ষা পেতে চাই যুগ খলীফার আনুগত্য।

সূচী পত্র

	পৃষ্ঠা নং
● কুরআন শরীফ	৪
● হাদীস শরীফ	৫
● অমৃত বাণী	৬
● জুমুআর খুতবা ঃ *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৭-১৫
● জুমুআর খুতবা ঃ *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	১৬-২২
● কুরআন আমার প্রিয় কুরআন আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৩-২৮
● ইসলামে খিলাফত ফরিদ আহমদ (যুক্তরাজ্য)	২৯
● প্রেস রিলিজ	৩০-৩৭
● জ্ঞান জিজ্ঞাসা	৩৮-৩৯
● পিছন ফিরে দেখা	৪০
● ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য মাহমুদ আহমদ সুমন	৪১-৪২
● সংবাদ	৪৩-৪৪
● কৃষি কথা	৪৫-৪৬

প্রচ্ছদ : 'মসজিদ খাদিজা' বার্লিন, ডিজাইন – তারেক আহমদ (সবুজ)

বর্তমান বিশ্বের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে যুগ-খলীফা বলেন, "গত ১০০ বছরের পরিসংখ্যান নিন। আর আগের ১১/১২ শত বছরের আসমানী দৈব দুর্যোগের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন, এ ১০০ বছর এ ক্ষেত্রে কত এগিয়ে রয়েছে। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন–দৈব দুর্যোগ কিভাবে আমাদেরকে বার বার ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছে।.....এসব দেখে আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। খোদাকে চিনা প্রয়োজন" (খুতবা জুমুআ, ২৪-০৮-০৭)।

যাই হোক বর্তমান ও অতীতের ঘটে যাওয়া এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে একটা বিষয় অবশ্যই অনুধাবন করা উচিত যে ঐশী নেতৃত্বের অভাব। খোদার কাছে এসব দুর্যোগ থেকে উদ্ধারের জন্য বিনীতভাবে দোয়ার প্রয়োজন। আমরা যদি সবাই ঐশী খিলাফতের আওতায় চলে আসি এবং তাঁর কাছে এসব দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করি তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হিফাযত করবেন।

কুরআন শরীফ

সূরা হূদ-১১

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾

১৮। যে-ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে এবং যার পরে তাঁর পক্ষ থেকে (সত্যায়নকারীরূপে) একজন সাক্ষী আসবে এবং যার পূর্বে পথনির্দেশক ও রহমতরূপে মূসার কিতাব রয়েছে, সেক্ষেত্রে সে কি (করে মিথ্যা দাবীদার হতে পারে)[১৩০৪] ? তারা তার প্রতি ঈমান আনবে। আর বিভিন্ন দল থেকে যে-ই তাকে অস্বীকার করবে আগুনই হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এ বিষয়ে কোন সন্দেহে থেকো না। নিশ্চয় এ-ই হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ
يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯। আর যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? এদেরকেই এদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন সাক্ষীরা[১৩০৫] বলবে, 'এরাই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল।' শোন, এ যালেমদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

১৩০৪। এই আয়াতে নবী করীম (সা.)-এর সমর্থনে ৩টি যুক্তি দেয়া হয়েছে–এসব কথা দ্বারা যেমন (ক) 'যে তাঁর প্রভুর কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, (খ) 'যার অনুসরণ করে তাঁর কাছ থেকে একজন সাক্ষী আগমন করবে' (গ) 'তাঁর পূর্বেও মূসার গ্রন্থ পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ ছিল'। 'তাঁর প্রভুর কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন' দ্বারা বুঝায়, একটি দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত জাতির জীবনে রসূল পাক (সা.) যে মহৎ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এবং যারা তাঁর সত্যতার সাক্ষীরূপে জ্বলন্ত নিদর্শন, তারা হলেন নবী করীম (সা.)-এর অনুসারী, তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণে বিভূষিত হয়ে মানব জাতির জন্য আদর্শ শিক্ষাগুরুরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের নৈতিক শিক্ষা ও আমল দ্বারা ইসলাম এবং কুরআনের সত্যতাকে যুগে যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 'সর্বোত্তম অনুগমনকারী সাক্ষীর আগমন' করা দ্বারা আহমদীয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে বুঝায়। 'তার পূর্বেও মূসার গ্রন্থ' দ্বারা বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা নির্দেশ করছে।

১৩০৫। এসব সাক্ষী দ্বারা সত্য নবীদেরকে বুঝাচ্ছে।

হাদীস শরীফ

জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক বড়

কুরআন ঃ

'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আত্বকাকুম'

অর্থাৎ-নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী।

(সূরা হুজুরাত ঃ ১৪ আয়াত)

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার বন্ধু শুধু মুত্তাকীগণই হবেন, যতই না আমার নিকটাত্মীয় থাকুক। লোকেরা আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) পূণ্যকর্ম নিয়ে আসে না বরং তোমরা দুনিয়া নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আস এবং বল হে মুহাম্মদ! (আমাদের সাহায্য কর), আমি বলি এভাবে নয় এভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে এই ব্যাপারে আমি অনিহা প্রকাশ করি।

ব্যাখ্যা ঃ আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতির চাবিকাঠি হলো আমল বা পুণ্যকর্ম। আমলই বান্দাকে তার খোদার নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়। খোদার কাছে শুধু মাত্র আমলই গ্রহণীয়–বংশ নয়। যদি বংশই খোদার নৈকট্যের পথ হতো তাহলে আমলের আর কোন প্রয়োজন হতো না। কুরআন ও হাদীস আমাদের বলে, খোদা তাঁর বান্দাদের একমাত্র আমল দেখে থাকেন আর কিছু নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন, 'মানুষ যতটুকু করবে ততটুকুই প্রতিদান পাবে'। হযরত রসূল করীম (সা.) তাঁর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)কে বলেন, হে আমার কন্যা! কিয়ামতের দিন শুধু তোমার আমলই কাজে আসবে। এই হাদীসে এটাও বলা হয়েছে, তোমরা সময় নষ্ট করো না, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ো না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও।

ইউরোপিয়ানরা যেভাবে নিজেদের বংশীয় গৌরবকে উন্নতির পথে বাধা বা অহংকার মনে না করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে, তোমরাও বংশীয় মর্যাদাকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক মনে না করে যে কাজই করতে হোক না কেন, কর এবং এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

রসূল পাক (সা.) বলেন, বেশির ভাগ লোক এই পার্থিব জগতের প্রতি ধাবমান ও পার্থিব জগতের সমৃদ্ধি কামনা করছে কিন্তু তারা এতদসত্বেও খোদার জান্নাত কামনা করে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের রক্ষা করুন। তিনি বলেন, এভাবে তো কখনই হতে পারে না। তোমরা জেনে নিও, খোদার নৈকট্য লাভ করার জন্য শুধু তোমাদের আমল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

তাই আমাদের সকলের উচিত, নিজেদের আমল আখলাক উন্নত করা। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে আমরা একজন যুগ-খলীফার আশ্রয়ে রয়েছি। এরই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদেরকে বেশী বেশী খোদার দরবারে ঝুঁকতে হবে। যুগ খলীফার সকল আদেশ মেনে চলার মধ্যেই প্রকৃত মুক্তি এবং শান্তি। হে খোদা! তুমি আমাদের সকল কর্ম উন্নততর কর। (আমীন)

সংকলন ও অনুবাদ ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:)

এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজার করা মানবকূল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচু স্থান' দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা কালে, মৃত্যু ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ উন্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)

ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেব এবং শেঠ মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের শাহাদত বরণ উপলক্ষে শহীদদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা আর এর পরিপ্রেক্ষিতে জামাআতের সদস্যদের নসিহত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

(সূরা বাকারা ঃ ১৫৪-১৫৭)

এ আয়াত সমূহের অনুবাদ হচ্ছে, হে যারা ঈমান এনেছো, ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল-ফলাদির ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা পরীক্ষা নিব আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। ঐ লোকদের যাদের ওপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

(সূরা বাকারা ঃ ১৫৪-১৫৭)

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

এ আয়াত সমূহের তেলাওয়াত শুনে আপনারা হয়তো অনুধাবন করতে পারছেন আজ আমি কিছুদিন পূর্বে ঘটে যাওয়া আমাদের ভাই ও বুযুর্গদের শাহাদত সম্বন্ধে বর্ণনা করব।

এ আয়াত সমূহে ধৈর্য্য, দোয়া আর শহীদদের মর্যাদা, পরীক্ষা নেওয়ার কারণ, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার দিকে মনযোগ আকর্ষণ আর সে কারণে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তদের বর্ণনা রয়েছে। আর এ সকল বিষয়ই এক মু'মিনের প্রকৃত মু'মিন হওয়ার চিহ্ন প্রদর্শন করে।

প্রথমে আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ঈমান আনয়নকারীদের চিহ্ন এই যে, বিপদের সময় তারা ঘাবড়ে যায় না। বরং প্রত্যেক বিপদ তাদেরকে খোদা তাআলার দিকে তাদের মনযোগ আকৃষ্ট করে আর খোদা তাআলার দিকেই এক মু'মিনের মনযোগ নিবদ্ধ

রাখা উচিত। আর এক মু'মিনের ও কর্তব্য হচ্ছে কোন বিপদে তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে ইসতাঈনু বিস্‌সাবরে ওয়াস্‌ সালাত প্রদর্শন করে। অর্থাৎ ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে। সুতরাং মু'মিনদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা সতর্ক করেছেন যে, তোমাদের ওপর বিপদ আসবে, কষ্ট আসবে, কিন্তু এমতাবস্থায় তোমাদের ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে, প্রথমত ধৈর্য্যের সাথে তা সহ্য করতে হবে, কোন অস্থিরতা ও ভীতি প্রকাশ করবে না। আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট কোন ধরনের অভিযোগ করবে না। দ্বিতীয়ত এগুলো থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মানুষের সামনে ঝুঁকবে না বরং একমাত্র খোদা তাআলার সামনে ঝুঁকতে হবে। তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। নিজের ঈমানী দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ধৈর্য্যের সাথে সে কাজ করে যেতে হবে যা খোদা তাআলা এক মু'মিনের ওপর ন্যস্ত করেছেন আর সে কাজ হচ্ছে খোদা তাআলার তৌহিদ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা। সে কাজ হচ্ছে আঁ হযরত (সা.) এর কাজ দুনিয়াতে বিস্তৃত করা। সে কাজ হচ্ছে দুনিয়াকে যুগ ইমামের জামাআতের অন্তর্ভুক্ত করে সত্যিকার ইসলামের সাথে পরিচয় করানো। সেজন্য হয়তো তোমাদের মালী কুরবানী করার ক্ষেত্রে কষ্ট করা লাগবে। আধ্যাত্মিক কষ্ট কি? আমাদের কলেমা উচ্চারণ করতেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)কে মন্দ নামে ডাকা হয়। সুতরাং এ কাজের জন্য শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট এবং আধ্যাত্মিক কষ্টও সহ্য করে যেতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এদিকে মনযোগ আকর্ষণ আর মানসিক ভাবে মু'মিনকে এ সকল দুর্ভোগ এবং কষ্ট পোহানোর জন্য প্রস্তুত করার পর বলেছেন, যদি তোমরা ধৈর্য্য, সাহস এবং দোয়ার মাধ্যমে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা কর, তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবেন। তোমাদেরকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না। বরং তিনি এমন ধৈর্যশীলদেরই সাথে আছেন আর পরিশেষে ধৈর্যশীলরাই বিজয় লাভ করবে।

এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা জীবন কুরবানকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, ধর্মের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গকারীদের খোদা তাআলার নিকট এক বড় মর্যাদা রয়েছে।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, শত্রুরা তোমাদেরকে এজন্য হত্যা করে যে প্রাণ সংহার করে তারা তোমাদেরকে সংখ্যার দিক থেকেও কম আর দুর্বল করে দেয়। কিন্তু স্মরণ রাখো যে, যখন আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সাথে আছেন, তখন এক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির নিহত হওয়ায় জামাআতের মৃত্যু হয় না। বরং আল্লাহ্‌ তাআলা যিনি দু জাহানের মালিক, যদি এক ব্যক্তি এখানে মারা যায়, পর জগতে যখন সে জীবিত হয়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, এক ব্যক্তিকে হত্যার ফলে জামাআত মরে যায় না। বরং এক ব্যক্তির মৃত্যু আরো কজন মু'মিনের জীবন লাভের উপকরণ হয়ে যায়। এক শাহাদত মু'মিনদের ভীত করে না বরং তাদের মধ্যে সেই ঈমানী উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা ঈমানী দিক থেকে কয়েকজন দুর্বলকে আলস্য থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে। ঈমানে তারা উত্তাপ সৃষ্টি করে দেয় যাতে ভীত হওয়ার পরিবর্তে আরো কজন বুক পেতে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায় আর ঘোষণা করে যে, হে মূর্খের দল, তোমরা কি ভেবে নিয়েছো যে এক ব্যক্তিকে নিহত করে তোমরা আমাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছো? তবে শোন, এই এক ব্যক্তির মৃত্যু আমাদের মাঝে সেই জীবন সঞ্চার করেছে, যা আমাদেরকে সেই জীবন দান করেছে, আমাদের আত্মত্যাগ করার সেই জ্ঞান দান করেছে, যদ্বারা আমরা এক নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ধর্মের জন্য সর্ব প্রকার আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছি।

কিছু দিন পূর্বে যখন ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবকে শহীদ করা হয়, তখনও আমি এ দৃশ্য দেখেছি। মৌখিকভাবেও আর লিখিত ভাবেও আমার সম্মুখে এটা প্রকাশ করা হয়েছে, যদি ওমুক স্থানে যেখানে আমরা থাকি, রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন পরে অথবা কোন ভয়ানক স্থান যেখানে কোন আহমদীর জীবন কুরবানী করার প্রয়োজন হয়, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে সুযোগ দিন যেন আমরা রক্ত দিতে পারি।

সুতরাং এক তো খোদা তাআলার পথে জীবন দানকারী, তার পশ্চাতে রয়ে যাওয়াকারীদের ঈমানে আরো সমৃদ্ধি লাভের কারণ হয়ে তাদেরকে জীবিত করে। যা তাদের মর্যাদা আরো উন্নীত করে আর চিরকালীন জীবনে তাদের মর্যাদা উচ্চতর হতে থাকে আর একজন মু'মিনের জীবনের উদ্দেশ্য এটাই যে এ জগতে সে এমন কাজ করে যাতে পরজগতে কল্যাণ লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ্‌ তাআলার সুস্পষ্ট এই ঘোষণাও রয়েছে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহতরা মৃত নয় বরং জীবিত, কেননা তারা খুব দ্রুত সেই মর্যাদা লাভ করে যদ্বারা তারা খুব দ্রুত খোদা তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিন না একদিন মরতে

হবে। কিন্তু সেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জীবন এক নিশ্বাসেই সবাই লাভ করতে পারবে না। প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে এক অন্তবর্তীকালিন অবস্থায় থাকতে হয় কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা শহীদদের সম্বন্ধে বলেছেন, সে খুব দ্রুত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জীবন লাভ করবে। একটি হাদীসে এসেছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার নিকট শহীদদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথম ঃ রক্তের প্রথম বিন্দু ঝড়ে পরার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ সে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নিবে।

তৃতীয়ত ঃ তাকে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

চতুর্থত ঃ সে বড় ভয় থেকে মুক্ত থাকবে।

পঞ্চমত ঃ তার মাথায় এমন উজ্জ্বল মুকুট রাখা হবে যার একটি পদ্মরাগমনি দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছুর চাইতে উত্তম হবে।

ষষ্ঠত ঃ তাকে সত্তর জন নিকটাত্মীয়ের সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হবে।

সুতরাং এই হচ্ছে শহীদদের মর্যাদা। (আহইয়াউন) যা (হাইউন) এর বহুবচন এর এক অর্থ হচ্ছে জীবনের আমল বৃথা যায় না। সুতরাং শহীদগণ খুব জলদি এই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জীবন লাভ করে যা হাদীস থেকেও সুস্পষ্ট। যা লাভের জন্য প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে এক নির্দিষ্ট অন্তবর্তীকালীন সময় অতিক্রম করতে হয়। আর সেই সময় প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক অবস্থানুযায়ী হয়। কেউ তা জলদি অর্জন করে আর কেউ দেরীতে অর্জন করে। (আহইয়া) এর এক অর্থ; যার বদলা নেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা শত্রুদের বলেন, তোমরা এক জীবন পার করে এটা ভেবে নিয়েছো যে আমরা অনেক নেকী অর্জন করেছি আর আমরা জামাআতকে দুর্বল করে দিয়েছি। কিন্তু স্মরণ রাখ, মৃত্যুবরণকারী শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য তো পেয়েই গেছে আর তারা তাদের শাহাদতের পুরস্কারও পাবে। মনযোগ দিয়ে শোন। হে দৃষ্টিহীনগণ! শহীদের রক্ত কবে বৃথা গেছে যে এখন যাবে। আজও খোদা তাআলা প্রত্যেক শহীদের এক একটি রক্ত বিন্দুর প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ওয়ালা কিল্লা তাশ্উরুন"** দুনিয়াবাসীরা এ বিষয়টি বুঝতে পারে না। তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি এত লোপ পেয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার কালাম পাঠ করা সত্ত্বেও, নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করা সত্ত্বেও, এসকল আচরণ করে তোমরা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জন করছ।

স্মরণ রাখ, মৃত্যুবরণকারী শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য তো পেয়েই গেছে আর তারা তাদের শাহাদতের পুরস্কারও পাবে। মনযোগ দিয়ে শোন। হে দৃষ্টিহীনগণ! শহীদের রক্ত কবে বৃথা গেছে যে এখন যাবে। আজও খোদা তাআলা প্রত্যেক শহীদের এক একটি রক্ত বিন্দুর প্রতিশোধ নেবেন।

আল্লাহ্ তাআলা এক স্থানে বর্ণনা করেছেন,

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٤﴾

(সূরা আন নিসা ঃ ৯৪ আয়াত)

অর্থাৎ- আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সে সেখানেই দীর্ঘকাল অবস্থান করবে আর আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন আর তাকে নিজের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন আর তার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করবেন।

আঁ হযরত (সা.) এক স্থানে মু'মিনের প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। উসামা বিন যায়েদ (রা.) আর এক আনসারী একবার এক কাফেরের পিছু ধাওয়া করলেন, যখন তাকে ধৃত করে পরাজিত করলেন, তখন সে কলেমা পাঠ করল। উসামা (রা.) বললেন, আমার আনসারী বন্ধু তাকে আর কিছু না বলে তার উপর হাত উঠানো থেকে বিরত হয়ে গেলেন। কিন্তু আমি তাকে হত্যা করলাম। ফেরৎ আসার পর যখন আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করা হল, তখন তিনি বললেন, হে উসামা! কলেমা তৌহীদ পাঠ করার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে। **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** পাঠের পরও তুমি তাকে হত্যা করলে। বার বার তিনি এ কথগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে তরবারির ভয়ে কলেমা পড়েছিল। তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে সে মন থেকে বলেছে নাকি তরবারির ভয়ে বলেছে? তখন আমার আফসোস হল হায়! যদি আজকের পূর্বে যদি আমি মুসলমান না হতাম।

(সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

এক বর্ণনায় আবু মালেক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.)কে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ স্বীকারোক্তি প্রদান করবে, আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে কোন উপাস্য নেই আর আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের অস্বীকার করবে তার প্রাণ ও সম্পদ পবিত্র হয়ে যাবে। তার বাকী হিসাব আল্লাহ্র অধীনে। (মুসলিম কিতাবুল ঈমান)

এখন নামধারী যে সকল আলেমরা মুসলমানদের বিভ্রান্তিতে ফেলে প্রতারণা করছে আর বলে বেড়াচ্ছে আহমদীরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র কেবল এক অংশের ওপর ঈমান রাখে। শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র ওপর ঈমান রাখে না। দ্বিতীয় অংশ অস্বীকার করে, এজন্য তারা ওয়াজিবুল কতল (হত্যা যোগ্য) হয়ে গেছে। এ সকল লোক কি আমাদের বুক চিরে দেখেছে যে আমাদের মনে কি আছে?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্বন্ধে আমাদেরকে যে উপলব্ধি ও জ্ঞান দান করেছেন, এ সকল মৌলবীদেরতো তার কোটি ভাগের এক ভাগও জ্ঞান নেই আর আমাদের সম্বন্ধে বলে যে আমরা খতমে নবুওয়ত অস্বীকারকারী আর সে জন্য হত্যা যোগ্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে খতমে নবুওয়তের যে মর্যাদা অবগত করেছেন তা হচ্ছে– তিনি (সা.) বলেছেন, "হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা কত উঁচু আর এ সত্যের সূর্য্যের কেমন উচ্চ পর্যায়ের প্রভাব রয়েছে যার আনুগত্য কাউকে মু'মিন বানায়, কাউকে খোদা প্রেমীর মর্যাদা দান করে, কাউকে আয়াতুল্লাহ্ আর হুজ্জতুল্লাহ্র মর্যাদা দান করে আর খোদার প্রশংসনীয় গুণাবলীর উত্তরাধিকারী বানান। (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৭০-১৭১)

অতঃপর তিনি বলেন, "সেই মানব যিনি সবচাইতে কামেল ও পরিপূর্ণ মানব ছিলেন আর কামেল নবী ছিলেন আর পূর্ণ কল্যাণরাজীসহ এসেছেন যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উত্থানের ফলে দুনিয়ার প্রথম কেয়ামত প্রকাশিত হয়েছে আর তার আগমনে জীবন লাভ হয়েছে। সেই বরকতময় নবী হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুস্সুফিয়া, খাতামুল মুরসালিন, নবীদের গর্ব জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হে আমাদের খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি সেই রহমত ও দুরূদ প্রেরণ কর যা দুনিয়ার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত তুমি কারো কাছে প্রেরণ করনি। (ইতমামুল হুজ্জাহু, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

অতঃপর তিনি আঁ হযরত (সা.) সম্বন্ধে বলেছেন,

"তার আনুগত্য এবং ভালবাসায় আমরা রুহুল কুদ্দুস (পবিত্রাত্মা) খোদার সাথে বাক্যালাপ এবং ঐশী নিদর্শনসমূহ পুরস্কারস্বরূপ পেয়ে থাকি। (তিরয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪১)

সুতরাং এ হচ্ছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যাদা, আর বর্তমানের এই ফিতনাবাজ এবং মন্দ স্বভাবের নামধারী আলেমগণ বলেন, আঁ হযরত (সা.)কে আহমদীরা শেষ নবী মানে না। এজন্য তারা ইসলামের গন্ডী বহির্ভুত আর হত্যা যোগ্য আর মিডিয়াতে তা প্রচার করা হচ্ছে। তারা যেসব কাজ করছে খোদা তাআলাও এ ধরণের কাজের অনুমতি দেন নি আর খোদার রসূলও অনুমতি দেননি আর দুঃখের বিষয় এদের নামেই নির্যাতন করা হচ্ছে।

সুতরাং এই রসূলের আনুগত্য আমাদেরকে নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে পুরস্কৃত করেছে। এখনও সময় আছে তোমরা ফিতনাবাজী এবং আহমদীদের উপর নির্যাতন করা থেকে বিরত হও। নয় তো স্মরণ রাখ যে, **"ওয়া উমলি লাহুম ইন্না কাইদী মাতিন"** (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮৪)।

অর্থাৎ, এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।

পূর্বে যেমন এর সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল, আজও তেমনি প্রকাশিত হতে পারে আর হবেও।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার অবকাশকে নিজেদের বিজয় মনে করো না। হ্যাঁ, আমরা যেহেতু দৃঢ় ঈমান রাখি, যুগের ইমামকে মেনেছি যাঁকে আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য, তাঁর (সা.) কাজ সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর দাসরূপে নবীর মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এজন্য খোদা তাআলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য আর সাহসের সাথে তোমাদের অত্যাচার সহ্য করছি, এ যুগের ইমাম তোমাদেরকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন আর তোমাদের কাছে এটাই প্রত্যাশা করেছেন। আর আল্লাহ্ তাআলাই আমাদের বলেছেন ভয় এবং ক্ষুধা আর প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে আর যখন তোমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখন

সৌভাগ্যবান রূপে তোমরা **"ফাবাশ্‌শিরিছ ছোয়াবিরিন"** (ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও) এর দলে অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐ ধৈর্য্যশীলদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার সুসংবাদ যেহেতু আমাদের সাথে আছে, তবে দুনিয়াবী ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণের ক্ষতি কি কষ্ট পৌঁছাতে পারে। এই কষ্ট যেভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ, সেখানে জামাতি উন্নতিরও কারণ। সুতরাং আমাদের আহমদীদেরও এই বিপদাপদ ও কষ্ট দেখে ঘাবড়ানো উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, নিজেদের ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক আর যখনই বিপদাপদ এবং কষ্ট আসবে, তখন চূড়ান্ত ধৈর্য্য প্রদর্শন পূর্বক তোমাদের মুখ থেকে শুধুমাত্র যেন এই শব্দাবলী উচ্চারিত হয় **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন** অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্ তাআলারই আর অবশ্যই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হব আর যখন আমরা এটা বলব, তখন আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও বরকত অর্জন করব। সর্বদা আমরা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব, ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে থাকব আর শেষ বিজয়ের দৃশ্য অবলোকনকারী হব। ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "খোদা তাআলার নেয়ামতরাজী তারাই লাভ করে যারা ধৈর্য ধারণ করে।"

সুতরাং ধৈর্য এবং দৃঢ়তা **"ফাতাহ্না লাকা ফাত্‌হাম মুবিনা"** (নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করব) এ সুসংবাদ বয়ে আনবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মান্য করার কারণেই আমাদের বিরোধিতা হচ্ছে। আমাদের কষ্টও দেয়া হয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মানার কারণে। আমাদের প্রিয়দের শহীদ করা হয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মানার কারণে। সুতরাং আমরা ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করলে, পরীক্ষা সমূহে সফলভাবে উত্তীর্ণ হব আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারেরও হকদার বলে বিবেচিত হব যা আল্লাহ্ তাআলা তাকে (সা.) ইলহামসমূহে কয়েকবার বর্ণনা করেছেন, **"ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্‌হাম মুবিনা"** (সূরা আল ফাতাহ ঃ ২০ আয়াত) অর্থাৎ আমি তোমাকে এক প্রকাশ্য মহা বিজয় দান করব।

সুতরাং জাতীয় জীবনে দুঃখকষ্ট, পরীক্ষা আল্লাহ্ তাআলার কুদরতসমূহ প্রদর্শনের জন্য এবং নিদর্শনাবলী প্রকাশের জন্য আসে। সুতরাং ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করতে থাক।

শাহাদতের যে ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে আর কিছু স্থানে জামাআত যে কষ্ট ও কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে তার পিছনেও **"ফাতাহ্না লাকা ফাত্‌হাম মুবিনা"** (আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করব) আওয়াজ আসছে। খোদা তাআলা শত্রুদের কখনো আনন্দিত হতে দেবেন না। তাদের আনন্দ মেকী আনন্দ আহমদীদের প্রত্যেকটি শাহাদতের ঘটনাই ফুল ও ফল প্রদান করে আর এখনো ইনশাআল্লাহ্ তাআলা ফুল ও ফল প্রদান করবে। শত্রুদের পাকড়াও করার দৃশ্য আমরা পূর্বেও দেখেছি আর আজও আল্লাহ্ তাআলার এই কালাম আমাদেরকে সান্তনা প্রদান করে, **"ফা আখাজাহুমুল্লাহু বিজুনুবিহিম ওয়ামা কানা লাহুম মিনাল্লাহি মিওঁ ওয়াক"** *(আল মু'মেন ঃ ২২)*।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেও তাদের পাপের দরুন ধৃত করলেন আর তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সুতরাং অতীতে যে ভাবে আল্লাহ্ তাঅলা পাকড়াও করেছেন, সেভাবে আজও আমাদের সেই জীবিত খোদা তাদেরকে কষ্টদায়ক পরিণামের সম্মুখীন করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ আমাদের প্রিয় খোদা যিনি অঙ্গীকার রক্ষাকারী। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে কৃত অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ করবেন যেভাবে আমরা পূর্ণ হতে দেখে আসছি।

আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদের সান্তনা প্রদান করে বলেন, আর তিনি বিভিন্ন সময় দৃশ্যাবলী প্রদর্শন করতে থাকেন। একই বিষয় কয়েকবার প্রদর্শন করেন আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও দেখাতে থাকবেন। সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে ঈমানের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

নিজের ঐ সকল ভাইদের গুণাবলীও যেন আমরা মরতে না দেই যারা জামাআতের সাথে বিশ্বস্ততার উচ্চতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে নিজেদের জীবন খোদা তাআলার রাস্তায় কুরবান করে দিয়েছেন।

এখন আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে এ সকল শহীদদের সম্বন্ধে বর্ণনা করব। প্রথম শহীদ আমাদের অতি প্রিয় ভাই ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী, তার শাহাদত ২৭শে মের পর প্রথম শাহাদত। অর্থাৎ এই মহান শহীদও নিজ জীবন খোদা তাআলার পথে দান করে এটা প্রমাণ করেছেন খিলাফতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দীতেও আমাদের ঈমানে সেই দৃঢ়তা রয়েছে। জামাআতের জন্য

নিজেদের প্রাণের কুরবানী পেশ করতে আমরা ঐভাবেই প্রস্তুত আছি যেভাবে বিগত ১০০ বছর বা তার অধিক সময় ধরে জামাআত কুরবানী করে আসছে।

এই শহীদ যার বয়স কেবল ৫৬ বছর। যৌবনেই শাহাদত বরণ করে যুবকদের মধ্যেও একটি রূহ সঞ্চার করে গেছেন আর এই শিক্ষা যুবকদের জন্যও নিজের পেছনে ছেড়ে গেছেন যে দেখ প্রাণ যায় যাক কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গে কৃত বয়আতের ওপর কোন পরিবর্তন হতে দিও না। খিলাফতে আহমদীয়ার জন্য সর্ব প্রকার কুরবানী করতে প্রস্তুত থাক। ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেব খুব সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় অনেক অগ্রগামী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেক পূর্ব থেকেই তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। সিন্ধু প্রদেশ সফরকালে অতঃপর নাযেরে আলার দায়িত্বে থাকার সময়ও পুরনো সম্পর্ক ছিল। বরং এভাবে বলা উচিত, এই বংশের সাথেই আমাদের পুরনো সম্পর্ক ছিল। তার পিতাও যখন রাবওয়া আসত আমাদের পিতার কাছে অবশ্যই আসতেন। আর আমাদের ঘরে দীর্ঘ বৈঠক লেগে থাকত। বিশেষভাবে শুরার পর যেখানে জামাআতী বিষয়াদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোচনা হতে থাকত। তার পিতার নাম মোক্তার আব্দুর রহমান সিদ্দিকী। আমি যেমন বলছি, তাঁরও জামাআতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। খিলাফতের সাথে গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের পিতা সম্বন্ধে কিছু বলছি।

তিনিও প্রায় ৪০ বছর মিরপুর খাস জেলার আমীর ও হায়দ্রাবাদের বিভাগীয় আমীর ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর হিজরত করে যখন আব্দুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব পাকিস্তান আসেন তখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর সামনে হাজির হয়ে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদানের আবেদন জানান। যাতে হুযূর (রা.) বলেন, আপনি মিরপুর খাস, সিন্ধ চলে যান আর সেখানেই সেটেল হয়ে যান। সেখানে আমাদের বিশেষ মর্যাদাও আছে।

প্রত্যেক শহীদ যাওয়ার সময় এই বাণী প্রদান করে যায় যে আমি মারা যাই নি বরং জীবিত। এখন তোমরাও স্মরণ রাখ যে জামাআত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে আর খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততার এই সম্পর্ক তোমাদেরকেও জীবন প্রদান করবে।

তাদের কাছ থেকে আপনি সাহায্য পাবেন আর আপনার দ্বারাও তারা উপকৃত হবে। সুতরাং তিনি কোন বিচার বিশ্লেষণ না করেই সেখানে চলে গিয়ে আবাদ হয়ে গেলেন। আর খুব নিষ্ঠার সাথে জামাআতের সেবা করতে থাকেন।

এই ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেব যিনি শহীদ হয়েছেন তিনি ডাক্তার আব্দুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বিয়ের এগার বছর পর তিনি জন্মেছিলেন। সিন্ধ মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি এম, বি, বি, এস পাশ করেন। অতঃপর ১৯৮৮ সালে আমেরিকা চলে যান। সেখান থেকে আল্ট্রা সাউন্ডের ট্রেনিং নেন। অতঃপর ইন্টারনাল মেডিসিনে ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে পোষ্ট গ্রাজুয়েশন করেন আর আমেরিকান বোর্ড অফ ইন্টারনাল মেডিসিনের সার্টিফিকেট লাভ করেন। অতঃপর শিক্ষার্জনের পর ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেব সেখানেই চাকুরী করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার পিতা যখন জানতে পারেন যে তার ছেলে সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তিনি তাকে লিখেন, তোমাকে এ এলাকার সেবার জন্য মেডিক্যালে পড়িয়েছি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যেখানে আমাকে বলেছিলেন বসে যাও আর লোকদের সেবা কর। এই গরীব লোকদের সেবার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে মেডিক্যালে পড়িয়েছি আর আমেরিকা পাঠিয়েও পড়িয়েছি। তাই তোমাকেও এখানে সেবা করতে হবে। আমার ইচ্ছা এটাই যে, এই সিলসিলা যেন জারি থাকে। তখন তিনি তার পিতার ইচ্ছা পূরণ করেন আর জলদি আমেরিকা ছেড়ে মিরপুর খাস চলে আসেন আর এখানে সেবা করা শুরু করেন।

ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের নানা ডাক্তার হাশমতউল্লাহ্ খান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের মাতাও জীবিত আছেন। তার নাম সলিমা বেগম। তিনিও নেক, তাহাজ্জুদ গুজার, দোয়াকারী, মহানুভব, দয়াশীল, গরীবদের প্রতি দয়ালু মহিলা ছিলেন। তিনিও ৩৭ বছর মিরপুর খাস এর লাজনার সদরের দায়িত্ব পালন করেন আর লাজনাদের তরবিয়তে তারও ভূমিকা ছিল। বৃদ্ধাবস্থা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও খুব সাহসের সাথে তিনি তার ছেলের শাহাদতের সংবাদ শুনেন আর তাকে শেষ বিদায় জানান। এটা সেই

বৃদ্ধা মাতার জন্য খুব বড় কষ্টের কারণ ছিল। তাদের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তীতেও যেন তাদেরকে শোক সহ্য করার সান্তনাও ধৈর্য্য দান করেন।

ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেব বিভিন্ন বিভাগে জামাআতের সেবা করার সুযোগ পান। তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ১৩ বছর মিরপুর খাস জামাআতের সেক্রেটারী উমুরে আমার দায়িত্ব পালন করেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার আঞ্চলিক কায়েদ ছিলেন। সিন্ধ প্রদেশের খোদ্দামুল আহমদীয়ার তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন। আর ১৯৯৮ সালে তার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি তখন হাসপাতালও সামলান। ছোট ক্লিনিককে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল বানান। যাতে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নগর পার্কার ও থর পার্কার এলাকায় যা হিন্দু ও গরীবদের এলাকা ছিল সেখানে ডাক্তার সাহেব প্রতি মাসে ব্যক্তিগতভাবে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসাতেন আর অসুস্থ, অসহায় ও অভাবীদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য স্বয়ং যেতেন। আল্লাহ্‌র ফযলে হাজার হাজার রোগী তার হাতে আরোগ্য লাভ করে। তাঁর শাহাদতে গরীব ধনী সবাই কাঁদতে থাকে। দূর দুরান্ত থেকে তাকে দেখার জন্য লোকেরা এসেছিল। তখন আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই দাসকে দস্‌তে মসীহাঈ ও শাফা (আরোগ্য) প্রদান করেছিলেন, যদ্বারা তিনি দরিদ্রদের সেবা করতেন। আল্লাহ্ তাআলা সুপারিশের মাধ্যম বানিয়েছিলেন। মিরপুর খাস ব্যতীত পুরো সিন্ধ প্রদেশে তার সুনাম ও খ্যাতি ছিল। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে যৌবনেই তিনি বড় সুনাম অর্জন করেন। আহমদী এবং অআহমদীদের মধ্যে সমান ভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এবং তবলীগের খুব আগ্রহ ছিল তার। তাই বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে তিনি কেন্দ্রেও নিয়ে আসতেন আর নিজ তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রে প্রেরণও করতে থাকতেন। বিগত পাঁচ বছরে আমি দেখেছি প্রতিবার যখনই কোন দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রোগ্রাম হত, যাওয়ার পূর্বে দোয়ার জন্য লিখতেন যে, যেন সফলকাম হতে পারি আর আল্লাহ্ তাআলা সফলতা দান করতেন। তার শত্রুতার আরেকটি বড় কারণ ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ্। কেননা তিনি সিন্ধ প্রদেশের জমিদার. ধনী দরিদ্র সকলকে খুব তবলীগ করতেন। এজন্য সবস্থানে তবলীগের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতেন। তাই শত্রুরা তাকে শহীদ করে তবলীগের একটা মাধ্যম শেষ করতে চায়। কিন্তু নির্বোধরা এটা জানেনা যে, ডাক্তার আব্দুল মান্নান আল্লাহ্‌র পথে কুরবান হয়ে নিজের ন্যায় আরো ক'জন মান্নান সৃষ্টি করে যাবেন, ইনশাল্লাহ্। ডাক্তার সাহেবের বিয়ে মামাতো বোন আমাতুস্ শাফী সাহেবার সাথে হয়েছিল যিনি আমেরিকান ন্যাশনাল ছিলেন। তার দুটি বাচ্চা আছে। বড় মেয়ে ১৮ বছরের। তিনি এফ এস সি করেছিলেন। ১৩ বছরের আরেকটি ছেলে আছে। তার স্ত্রীও মিরপুর খাস এর সদর ছিলেন। ওয়াকফে জাদীদের যে হাসপাতাল নগর পার্কার এর মিঠি এলাকায় আছে, সেখানেও তিনি অনেক খেদমত করেন আর ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প বসাতে থাকেন। মানুষের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত আন্ নূর সোসাইটিরও তিনি সদর ছিলেন। সদর আঞ্জুমানের চুক্তিবদ্ধ কমিটির সদস্য এবং মজলিস তাহরীকে জাদীদ এর সদস্য ছিলেন।

আমি পূর্বেই বলেছি তার সাথে আমার পুরনো সম্পর্ক ছিল আর তার পিতার সাথেও আমার পিতার সম্পর্ক ছিল আর তার নানা হযরত ডাক্তার হাশমতউল্লাহ্ সাহেব যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রা.) চিকিৎসক ছিলেন। তার সাথেও আমাদের সম্পর্ক ছিল। ডাক্তার সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর কাসরে খিলাফতে থাকতেন। তার নিকট আসা যাওয়া ছিল। সুতরাং এই সমস্ত বংশের সাথে আমাদের এক বংশগত সম্বন্ধ ছিল।

ডাক্তার মান্নান সাহেব এমন লোক ছিলেন যার চেহারায় কখনো দুশ্চিন্তার প্রভাব পরত না, যেমন খুশি পরিস্থিতি হোক। মিরপুর খাস জেলা বিগত কয়েক বছর ধরে মৌলবীদের টার্গেট ছিল বরং পুরো সিন্ধই টার্গেট ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ এলাকার জামাআতগুলোকে তিনি খুব ভালভাবে সামাল দেন। বরং সাথের জেলাগুলোতেও নিজ সম্পর্কাদি ব্যবহার করে সাহায্য করতেন। কিন্তু কখনো নিজ সম্পর্কাদি নিজের জন্য ব্যবহার করেন নি। ব্যবহার যা করতেন তা জামাআতের কল্যাণের জন্যই। অতঃপর দিন হোক বা রাত যখনই কেউ সাহায্যের জন্য আহ্বান করত, তিনি হাসি মুখে তার সাহায্য করেছেন। তার এ বিষয়টি আমার খুব ভাল লাগত যে, তার চেহারায় সব সময় হাসি লেগেই থাকত। এ খাত শুধু আমিই বলি নি বরং প্রত্যেক গরীব এবং ধনী তা প্রকাশ করেছেন। তিনি খুবই বিনয়ী ছিলেন। এ ব্যাপারে কোন গর্বই ছিল না। সাধারণত আমীরগণ দাওয়াত ইলাল্লাহ্ ও মেডিক্যাল ক্যাম্পাসে স্বয়ং যেতেন না। কিন্তু মরহুম ডাক্তার সাহেব, যেমন আমি পূর্বে বলেছি, জামাআতি ব্যস্ততা না

থাকলে স্বয়ং যেতেন। কেউ আমার নিকট তার সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল ধারণা দিল। সে সিন্ধ থেকে আগত এক আহমদী ছিল, সে সিন্ধ এ দাঈআনে ইলাল্লাহ্‌র আমীর ছিল। তিনি দরিদ্রদের এত বেশী সাহায্য করতেন যে, তাদের শুধু ফ্রি চিকিৎসাই প্রদান করতেন না, বরং নিজের পক্ষ থেকেও কিছু দিয়ে দিতেন। তার মৃত্যুতে যখন আমীর ও জমিদারগণ আফসোস করতে জন্য আসেন, সেখানে দরিদ্র মহিলা ও পুরুষরাও খুবই আবেগাপ্লুত অবস্থায় ডাক্তার সাহেবের কথা স্মরণ করতে থাকেন। খিলাফতের সাথে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। আমি মনে করি যে তিনি আপাদমস্তক খিলাফতের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এবং বিশ্বস্ত ছিলেন আর উত্তম বন্ধু ছিলেন। তার ওপর আমার এতটা ভরসা ছিল যে আমি কখনো ভাবতেও পারতাম না যে তাকে কোন কাজের কথা বলি, কোন রিপোর্টের জন্য পাঠাই আর তাতে কোন ধরনের অবিচার হবে আর তাক্‌ওয়ার পরিপন্থী কোন কথা বলা হবে। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ তিরস্কারের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কোন ভয়ভীতি ছাড়াই নিজের কাজে মগ্ন থাকেন। তাকে কিছু দিন পূর্বে কোন নিকট আত্মীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যে সাবধান হও। তখন তিনি তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, দেখা যাক যা হবার হবে। তিনি জামাআতের এক উত্তম সদস্য ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তার মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর করতে থাকুন। শহীদ হয়ে সে মর্যাদা তো তিনি পেয়েই গেছেন, এখন আল্লাহ্ তাআলা তার মর্যাদা বাড়াতে থাকবেন। তার স্ত্রীকেও ধৈর্য্য এবং সান্তনা প্রদান করবেন। তিনিও খুব সাহসের সাথে নিজের স্বামীর শাহাদতের সংবাদ শুনেন আর ধৈর্য্যের উত্তম নমুনা প্রদর্শন করেন। নিজের শ্বাশুরী যিনি তার ফুফুও ছিলেন তাকেও সামলান আর নিজের বাচ্চাদেরও সামাল দেন। আমেরিকাতে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও তার স্বামীর সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে সঙ্গ দেন আর জামাআতী কাজে কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নি, বরং সেবা করে গেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দীর্ঘ জীবন প্রদানের সাথে সাথে বাচ্চাদের আনন্দও যেন দেখান।

ডাক্তার সাহেবের মৃত্যুতে বিভিন্ন জামাআতের লোকেরাও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। তার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি–

প্রথমে এম কিউ এম এর নেতা আলতাফ হোসেন সাহেবের এক বর্ণনা পেশ করছি যিনি এখানেই (লন্ডন) থাকেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের মৃত্যু মিরপুর খাস এর শহরবাসীর জন্য এক বড় ক্ষতি ছিল। তিনি বলেন, আততায়ী, হত্যাকারী বর্ণ, বংশ, ভাষা, ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে কোনরূপ পার্থক্য না করে সহস্র সহস্র রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানকারী ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবকে হত্যা করে প্রমাণ করেছেন এই মৌলবাদী মুসলমান তো নিকৃষ্ট মানুষ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যও নয়। সে ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবকে নির্মম ভাবে হত্যার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন,

সিন্ধ এর ধর্মীয় উগ্রতা ও তালেবানাইযেশনের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের ফল। যে ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্ম বিশ্বাস ও ফিকাহ্‌র মতবিরোধের ভিত্তিতে নিষ্পাপ শহরবাসীদের হত্যা করছে সে মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য শত্রু।

অতঃপর পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন মিরপুর খাস এর প্রধান বক্তব্য প্রদান করেন যে ডাক্তার মান্নান এর হত্যা মনুষ্যত্বের হত্যা।

কিন্তু আজকালকার নামধারী আলেমরা, যারা নিজেদেরকে কুরআন করীমের আলেম মনে করে, তারা বুঝতে পারবে না যে খোদা তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যে নিজে কখনো হত্যা করেনি আর দেশে বিশৃঙ্খলাও ছড়ায়নি, তার হত্যা পুরো মনুষ্যত্বের হত্যা। আর ডাক্তার সাহেবের ব্যক্তিত্ব এমনই ব্যক্তিত্ব ছিল, যিনি প্রতি মুহূর্তে মানুষের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন আর অন্যেরাও এ কথাই বলছে।

অনেক ডাক্তার সাহেবদের একটি টিম আর বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ডাক্তাররা প্রতিক্রিয়া প্রদান করেন যে, ডাক্তার সাহেব আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ, প্রিয়জন এবং সহমর্মী ছিলেন। তিনি এক মহান মানুষ ছিলেন। এ ঘটনায় জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন ফেরেশ্‌তা সদৃশ লোক শতাব্দীতে একজনও জন্মে না।

অতঃপর বড় বড় জমিদার শ্রেণীর লোকেরা আসেন। তারা ঐ সময় নামতো নিতে পারে না। তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল এটি শুধু আপনাদের জামাআতের ক্ষতিই নয়, বরং আমরা সকলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি।

অতঃপর কজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন যে, তিনি গরীবদের সহমর্মী, অসহায়দের আশ্রয় ছিলেন। তার হাসি লোকদের হৃদয় জয় করত। তার চরিত্র বর্ণনাতীত সুন্দর ছিল।

অতঃপর ঐ এলাকার প্রতিনিধিবৃন্দ বিবৃতি প্রদান করেন, মিরপুর খাস এক উত্তম ডাক্তার এবং সৎলোক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এটা খুব বড় জুলুম হয়েছে। এক নওমোবাইন (নবদিক্ষীত) বলেন, তিনি গরীবদের সহমর্মী ছিলেন। তিনি আমাদের সকলকে এতীম করে চলে গেছেন। তার হাসপাতালের কর্মচারীরা প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ডাক্তার সাহেব গরীবদের সাথী ছিলেন। দরিদ্রদের সাথে খুব হৃদ্যতার সাথে আচরণ করতেন। তিনি আমাদেরকে বাচ্চাদের ন্যায় লক্ষ্য রাখতেন।

এছাড়া সরকারী কর্মকর্তাগণ, ডি, এস,পি, ডি.পি.ও. ডি আইজি প্রমুখ যারা এসেছিলেন, তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল, শহীদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি খুব মহান ব্যক্তি ছিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলেন, এটি ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকীর হত্যা নয় বরং পুরো মিরপুর খাস এর হত্যা।

আমাদের দ্বিতীয় শহীদ শেঠ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব। ইনিও নওয়াব শাহ্ জেলার জামাআতের আমীর ছিলেন। যদিও তিনি বেশী শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামাআতের সেবা করার অনুপ্রেরণা তার মাঝে ছিল। ১৯৫৬ সালে নওয়াব শাহ্'তে এসে তিনি বসতি স্থাপন করেন। ১৯৬২ তে নওয়াব শাহ্ জামাআতের সদর নির্বাচিত হন। তার সদরের দায়িত্ব পালন কালে সেখানে এক বড় হল "মাহমুদ হল" বানানো হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তার নাম "মাহমুদ হল" রাখেন। তিনি দু' বছর জেলার কায়েদও ছিলেন। অতঃপর একাধারে তিনি ১৪ বছর সখরডিভিশন এলাকার কায়েদ ছিলেন। ১৯৯৩ সালে তিনি নওয়াব শাহ্'র আমীর নিযুক্ত হন আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে দায়িত্বেই ছিলেন। তিনি অনেক মিশুক, মেহমান নেওয়ায, সৃষ্টির সেবাকারী, দরিদ্রদের বিশেষ সেবাদানকারী, অন্যের প্রতি সহমর্মী আর সেখানে খুব জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সব সময় সকলকে প্রথমে সালাম করতেন আর খুব সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কথা বলতেন। চেষ্টা করতেন যেন কারো মন না ভাঙ্গে। ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের বিশেষ সম্মান করতেন আর তাদের সকল প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে শেঠ সাহেব মুসী ছিলেন। কিছুদিন থেকে তিনি নিজ ভবনে আরেকটি বড় মসজিদ এবং হল "আইওয়ানে তাহের" নামে নওয়াব শাহ্'তে নির্মাণ করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব পরিশ্রম করতেন। বরং কেউ আমাকে লিখেছেন যে, তার ঘর দোতলায় ছিল। নীচে দোকান প্রভৃতি ছিল। ডাক্তার তাকে সিড়ি দিয়ে উঠানামা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ঘরে বসে থাকতে পারেন নি। জামাআতের কাজ কিভাবে করতেন? তার ঘরের নিকটেই মসজিদ ছিল আর সেখানেই আমীরের দপ্তর ছিল। পাকিস্তানে লিফ্টের ব্যবস্থাও ছিল না, এখানে (লন্ডনে) যেভাবে দুস্থদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়, স্বয়ংক্রিয় চেয়ার বা ইলেকট্রনিক চেয়ার ছিল যা সিড়ির সাথে লেগে যায়। তিনি এর উপায় বের করেন, একটি চেয়ারের ন্যায় ছোট পিড়ি নিয়ে তার সাথে দড়ি বেঁধে দেন আর নিজের ঘরের চাকরদের বলে প্রতিদিন নীচে নেমে যেতেন আর সন্ধ্যার সময় তাতে বসেই টেনে উপরে চলে যেতেন। এভাবে সারাদিন জামাআতের কাজ করতেন। খুব অক্লান্ত এবং জামাআতের সেবাকারী ছিলেন। সুতরাং এই হচ্ছে জামাআতের সেবাকারীর অবস্থা।

প্রত্যেক শহীদ যাওয়ার সময় এই বাণী প্রদান করে যায় যে আমি মারা যাই নি বরং জীবিত। এখন তোমরাও স্মরণ রাখ যে জামাআত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে আর খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততার এই সম্পর্ক তোমাদেরকেও জীবন প্রদান করবে। তার স্ত্রীর বয়স ৬০ বছর আর শেঠ সাহেবের বয়স প্রায় ৭০ বছর ছিল। তার ৪ সন্তান আছে। একজন ডাক্তার, একজন ব্যবসায়ী, একজন উকিল আর এক ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মেয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে আছে। আল্লাহ্ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন, তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন।

এছাড়া ঐ দুজন আহতদের জন্যও দোয়ার এলান করতে চাই। একজন শেখ সাঈদ আহমদ সাহেব যাকে প্রথম রমযানের দিন বা একদিন পূর্বে চাঁদ রাতে করাচীতে তার দোকানে বসা অবস্থায় গুলি করে গুরুতর আহত করা হয়। আর দ্বিতীয়ত ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের সাথে গার্ড আরিফ সাহেব আহত হয়েছিলেন ইনিও গুরুতর আহত হন আর এ অসুস্থ দুজন অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছেন। আল্লাহ্ তাআলা তার নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করুন। রমযানে এই নামধারী মুসলমানদের দল পুণ্য অর্জনে আরো অগ্রগামী হয়ে যান আর তারা জানেন না যে আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকদের জন্য কি পরিণাম রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ও আর অন্য জাতিকেও এই মানুষের শত্রুদের থেকে নিরাপদ রাখুন। এ দিনগুলোতে অনেক দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাআলা সকলকে নিজ হিফাযতে রাখুন।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

সেই দোয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দোয়া আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় এর মাঝে প্রথম পর্যায়ের দোয়া হল তাঁর ধর্মের বিজয়ের উদ্দেশ্যে দোয়া করা

মানবজাতিকে খোদা তাআলার সামনে বিনয়াবনত হওয়ার জন্য দোয়া করা

রসূল করীম (সা.)-এর পতাকা তলে দুনিয়াকে সমবেত করার জন্য দোয়া

এ সকল দোয়া এমন দোয়া যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসাকে আকর্ষণকারী দোয়া

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٥﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٧﴾

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৪-১৮৭)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযাকে সেভাবেই ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বণ কর।

(ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; এবং যাদের পক্ষে এ (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাদের ওপর ফিদিয়া – এক মিসকীনকে খাবার দান করা। অতএব, যে কেউ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করবে, তা অবশ্য তার জন্য উত্তম হবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তা হলে জেনে রাখ, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণ কর।

রমযান সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছে কুরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারীর) জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে

কেউ এই মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেউ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৪-১৮৭)

আজকাল আমরা আল্লাহ্ তাআলার ফজলে রমযান মাস অতিক্রম করছি আর আমরা সকলেই জানি এটি রোযার মাস, আর আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় রোযা কোন উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার নিজ বান্দাদিগের তাক্ওয়ায় প্রবৃদ্ধি, তাদের রূহানী উন্নতি, তাদেরকে নিজ নৈকট্যে ভূষিত করা আর তাদেরকে দোয়া কবুলিয়্যতের পদ্ধতি এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত করণের উদ্দেশ্যে একটি তরবিয়তী কোর্সের মাধ্যম স্বরূপ এই রোযা রাখা আবশ্যক বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি এর মাঝে আল্লাহ্ তাআলা বলেন-"রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য হলো তোমরা যেন তাক্ওয়া অবলম্বন কর অর্থাৎ প্রত্যেক ধরনের বাজে কর্ম থেকে পরিত্রাণ লাভ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ কর।"

একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে রসূল করীম (সা.) বলেন-রোযা হলো ঢালস্বরূপ। (জামে তিরিমিযী, বাব মা জাআ ফি ফাজলিস সওম)। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযাকে নিজেদের ঢাল বানাবে তখন খোদা তাআলা স্বয়ং তোমাদের ঢাল হয়ে যাবে আর কেবল বড় বড় গুণাহ্ থেকেই রক্ষা করবে না বরং প্রত্যেক ধরণের ছোট ছোট গুনাহ্ সমূহ এবং ছোট ছোট দুশ্চিন্তা সমূহ থেকেও মুক্তি দিবে। প্রত্যেক ধরনের অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাবে এবং পুণ্য করারও সৌভাগ্য লাভ করবে কিন্তু শর্ত হলো, নিজেকে ঐ সকল শর্ত সমূহের অনুসরণ করতে হবে যা রোযার সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে নির্দেশ হলো 'যখন তোমরা রোযা রাখবে তখন তোমাদের কান, চোখ, জিহ্বা, হাত এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যেন রোযা রাখে।' অর্থাৎ ঢাল তখনই কল্যাণকর হবে যখন তোমরা এর ব্যবহার জানবে। কেবলমাত্র রোযা রাখাতেই তাকওয়ার উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয় বরং এর জন্য নিজের তরবিয়তও করতে হবে, নিজেকে ছাঁচে ফেলতে হবে, নিজেকে সুচারু করতে হবে, ঐ শর্তসমূহের এতায়াত করতে হবে যা খোদা তাআলা নির্ধারণ করেছেন। যেভাবে পরবর্তী দুই আয়াতে রয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থ্য অথবা মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নয় বরং এমতাবস্থায় রোযা না রাখা এবং পরবর্তী দিনসমূহে তা পূর্ণ করার নির্দেশ রয়েছে। কেননা, তাক্ওয়া আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের অনুকরণেই অর্জিত হয়-অভুক্ত থেকে নয়। এরপর কুরআন পাঠ করা, এর নির্দেশাবলীর উপর আমল করাও জরুরী। এছাড়াও অগণিত নির্দেশাবলী কুরআনে বর্ণিত আছে যার সংখ্যা হাজার হাজার।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থলে বলেন, কুরআন শরীফে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদেশ-নিষেধ এবং এলাহী আহ্কাম বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত রয়েছে আর কয়েক শত শাখায় বিভিন্ন ধরণের নির্দেশ বর্ণিত রয়েছে, সুতরাং যে ঢালের অন্তরালে আসার মাধ্যমেই তাক্ওয়া অর্জিত হয় তা হল রোযার ঢাল। এবং প্রকৃতপক্ষে এটি খোদা তাআলার ঢাল। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, রোযার প্রতিদান আমি স্বয়ং। এই হাদীসটি হাদীসে কুদসী অর্থাৎ যে হাদীস রসূল করীম (সা.) আল্লাহ্‌র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন।

(জামে তিরমিযী, বাব মা জাআ ফি ফাজলিস সওম)।

রমযানে যখন আত্মার পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করে কর্ণকে বাজে কথা শোনা থেকে বিরত রেখে কর্ণের হেফাযত করবে তখনই এ ঢাল ফলপ্রসূ হবে। প্রত্যেক ঐ সকল আড্ডা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে যেখানে ধর্ম নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হয়, ধর্মীয় কথা নিয়ে তামাশা করা হয়। এমন মজলিস যেখানে অপরাপরদের নামে, নিজ ভাইদের নামে চোগলখোরী ও বদনামী করা হয়। নিজের চোখকে সমস্ত ঐ সকল জিনিস দেখা থেকে বিরত রাখুন যা

আল্লাহ্ তাআলা দেখতে বারণ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, পুরুষদেরকে (গায্যে বাছার অর্থাৎ) চোখ অবনত রাখার নির্দেশ রয়েছে অর্থাৎ মহিলাদের দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। মেয়েদেরকে পুরুষদের দিকে না তাকানোর নির্দেশ রয়েছে। বেহুদা এবং বৃথা ফিল্ম সমূহ যা আজকাল সময় কাটানোর জন্য দেখা হয় এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে। এই দিনগুলোতে অর্থাৎ রোযার দিনগুলোতে রমযান মাসে এ অভ্যাস গড়ে তুললে আশা করা যায় পরবর্তী জীবনেও রোযার মাধ্যমে কল্যাণ লাভকারী ব্যক্তি এ বিষয় থেকে রক্ষা পাবে।

এরপর হলো জিহ্বার রোযা। আর তা হল মন্দ কথা বলে কাউকে কষ্ট দিওনা। অপর এক স্থলে হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রোযা অবস্থায় তোমাকে যদি কেউ গালমন্দ করে অথবা কঠিন কথা বলে অথবা ঝগড়া করার চেষ্টা করে তাহলে তুমি "ইন্নি সায়েমুন"-বলে নিশ্চুপ থাক এবং কোন প্রতি উত্তর করো না। (বুখারী কিতাবুস সওম)

অর্থাৎ আমি তো রোযাদার, তুমি যা কিছুই বল, আমি যেহেতু তরবিয়তী কোর্স অতিক্রম করছি, যেখানে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোযা রেখেছে তখন আমি তোমাকে প্রতিউত্তর করে নিজের রোযাকে মাকরূহ্ করতে চাই না।

এমনিভাবে হাতেরও রোযা রয়েছে, হাত দ্বারা কোন অপকর্ম করো না। তাকওয়া হলো অন্যদের ক্ষেত্রেও এমন কাজ করো না যা করতে খোদা তাআলা নিষেধ করেছেন অথবা কোন মন্দ কর্ম যা আল্লাহ্ তাআলার রসূল (সা.) মন্দ আখ্যা দিয়েছেন। যদি কেউ নিজে শূকর ভক্ষণ না করে অন্যদেরকে ভক্ষণ করায় তাহলে এটি নাফরমানী এবং অপরাধ। নিজে মদ পান করে না কিন্তু অপরকে পান করায় তাহলে এটিও গুনাহ্। রসূল করীম (সা.) মদ পান করানো ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন। সুতরাং রোযা তখনি ঢাল স্বরূপ হবে, আল্লাহ্ তাআলার তাক্ওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিতে তখনই পরিণত হবে, যখন এই বিধান নিজের উপর কার্যকর করবে যে বিধান আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মু'মিনের প্রতি রোযা রাখা অবস্থায় বিধিবদ্ধ করেছেন। যখন সে প্রশিক্ষণ অর্জন করবে তখন এর ফলে সে ঢালের প্রকৃত ব্যবহার করতে শিখবে। অন্যথায় রোযা কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। এটা নিজেকে ধোকা দেয়া এবং খোদা তাআলাকে ধোকা দেয়ার নামান্তর। রসূল করীম (সা.) বলেন, যদি সকল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের সাথে রোযা না রাখা হয়, সমস্ত ঐ সকল নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য রাখা না হয়, যেগুলো না করতে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং সমস্ত ঐ সকল বিষয় না করা হয় যেগুলো করতে আল্লাহ্ তাআলা আদেশ দিয়েছেন তাহলে তোমাদের অভুক্ত থাকা খোদা তাআলার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী কিতাবুস সওম)

সুতরাং এ দিনগুলোতে আমাদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে অর্থাৎ নিজেদেরকে ঐ সকল নিষেধাজ্ঞার মাঝে আবদ্ধ করতে হবে তাহলেই খোদা তাআলা আমাদেরকে সকল আদেশ নিষেধের আওতায় আমাদের জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করবেন। যেন তিনি আমাদের এ সকল কাজ কর্মে খুশী হন যেগুলো করার নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। আর সর্বদা তিনি যেন আমাদের ঢাল হয়ে থাকেন এবং শত্রুর সকল আক্রমণ থেকে নিজ নির্বাচিত বান্দাদেরকে যেভাবে তিনি সুরক্ষিত রাখেন ঠিক সেভাবেই আমাদেরকেও যেন রক্ষা করেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা এ মাসে, অর্থাৎ রমযান মাসে, আমাদের মনযোগ সে দিকে আকর্ষণ করছেন অর্থাৎ এ দিনগুলোতে আমার উদ্দেশ্য, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে , কেবল মাত্র নাজায়েয বিষয় থেকে বেঁচে চলাই নয় বরং কান, চোখ, জিহ্বা, হাতকে এক বিশেষ প্রচেষ্টায় সাধারণ অশোভন কর্ম থেকেও বিরত রাখা। এগুলোকে হিফাযত করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা-তো করতেই হবে কিন্তু কিছু জায়েয বিষয় থেকেও বিরত থাকতে হবে। এমন একটি জেহাদ করতে হবে যার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে ধৈর্য এবং বরদাশত সৃষ্টি হয় এবং ডিসিপ্লিন সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা তোমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যম হবে। আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির মাধ্যমে হবে, দোয়া গৃহীত হবার মাধ্যম হবে।

অবশেষে, আমি যে তেলাওয়াত করেছি, এর মাঝে এ বিষয়ই আল্লাহ্ তাআলা রোযার বিধান সমূহের সাথে বর্ণনা করেছেন কেবল তাই নয় এরপরেও রোযার সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশাবলী বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা রোযার নির্দেশাবলী এবং এর

বিস্তারিত বর্ণনার সাথে সাথে এর শেষ আয়াত যে আমি তেলাওয়াত করেছি **"ইন্নি কারিব"**-এর ঘোষণা দিয়েছেন। আর এই ঘোষণা দেয়া এ কথার দিকে স্পষ্ট ইশারা করে, "রমযানে আমার দিকে আগমনের উদ্দেশ্যে তোমরা যখন কল্যাণ লাভের চেষ্টা করবে ,সেক্ষেত্রে শুনে রাখো – এ ইবাদত এমন এক ইবাদত যার প্রতিদান আমি স্বয়ং আর এর প্রতিদান দেয়ার জন্য আমি তোমাদের একবোরেই সন্নিকটে আছি সুতরাং আমার বান্দা যদি আমার এ কথার প্রতি আমল করে, "ওয়াল্লাযীনা জাহাদূ ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। *(আনকাবুত ঃ ৭০)* অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা আমার সাথে সাক্ষাত লাভের প্রচেষ্টা করে, এর জন্য মুজাহেদা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে আগমনের সৌভাগ্য দান করবো।" আর আল্লাহ্ তাআলা কেবল আগমনেরই সৌভাগ্য দিবেন না বরং এমন আগমনকারীকে ধরার জন্য স্বয়ং তার নিকটবর্তী হন যে তার পথে জেহাদ করছে, আর খোদার প্রতিদান তো খোদা স্বয়ং। তাঁর পথে চেষ্টাপ্রচেষ্টাকারীর সম্বন্ধে তিনি **"ইন্নি কারিব"** বলে স্বয়ং তাঁর নিকটবর্তী হবার ঘোষণা দিয়েছেন।

একবার বে-পরোয়া এক মহিলা এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিল। আর যে বাচ্চাকেই দেখছিল তাকেই বুকে জড়িয়ে নিচ্ছিল এবং ভালবেসে আদর করে আবার তাকে ছেড়ে দিচ্ছিল। মহিলা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তান খোঁজ করছিল। অবশেষে সে তার বাচ্চা খুঁজে পেল এবং বুকে জড়িয়ে সেখানেই বসে পড়লো এবং আদর করতে থাকলো। তার চেহারায় এক প্রশান্তি বিরাজ করছিল। আঁ হযরত (সা.) তাকে দেখে সাহাবাদেরকে বল্লেন, যেভাবে এ মহিলা দু:শ্চিন্তা গ্রস্থ হয়ে নিজ সন্তানকে খোঁজ করছিল এবং সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে তাকে খোঁজছিল কেননা স্থানটি যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল। আর যখন সন্তান ফিরে পেলো তখন প্রশান্তি লাভ করে তাকে আদর করা শুরু করলো আর সেখানেই বসে পড়লো। আর খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আঁ হযরত (সা.) বল্লেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাকে তাঁর নিজের দিকে আগমন করলে আর নেকীর পথ অবলম্বন করলে যতটুকু এই মা খুশি হয়েছিল এর চেয়ে বেশী খুশী হন।

সুতরাং আমাদের খোদা যখন কিনা এত দয়াময় তখন আমাদের কী হয়েছে যে আমরা তাঁর দিকে আগমনের উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করব না? এক মা তার সন্তানের গুটি কয়েক দাবী বা আকাঙ্খার প্রতি লক্ষ্য রাখে আর তা আবার নিজের সাধ্যের মধ্যে এবং যাচনাকারীর অবস্থানুসারে। আমাদের প্রভু যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক যিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ, যিনি সমস্ত বিশ্বের মালিক। যিনি অসীম সম্পদ এবং শক্তির অধিকারী, তিনি যখন নিজ বান্দার প্রতি খুশি হয়ে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করবেন তখন তিনি ঐ বান্দার জন্য কি-না করতে পারেন।

সুতরাং এই রোযা তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং দোয়া কবুলিয়্যতের মাধ্যম। এ দিগুলোতে আমাদের কাজ হলো পূর্বের তুলনায় অধিক আর্তি করে, ক্রন্দন করে নিজ প্রভূকে আহ্বান করা। কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য রাখবে, কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রয়োজন পূর্ণ করার লক্ষ্যে তাকে ডাকবে না বরং নিজের আহ্বানে তাঁর সন্তুষ্টিকে-ও সম্মুখে রাখবে। আর তাঁর সন্তুষ্টি কী? তিনি বলেন, **"ফাল ইয়াসতাযিবূলী ওয়াল ইউমিনু বী"**

সুতরাং তাদের উচিত, 'তারা যেন আমার ডাকে লাব্বায়েক বলে, আর আমার প্রতি ঈমান আনে।' আল্লাহ্র ডাকে লাব্বায়েক বলা তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা জরুরী। যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ ঈমান আনয়ন এবং ঈমানে উন্নতি করতে হবে। মু'মিনের প্রত্যেক পদক্ষেপ উন্নতির দিকে ধাবমান হওয়া উচিত।

এক স্থলে কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"ইয়া আইয়ূহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী।"** (নিসা ঃ ১৩৭) হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো। সুতরাং কেবল মুখে ঈমান আনা, আর বলা যে আমরা ঈমান এনেছি এটা যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহ্ তাআলা আশা করেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি তোমাদের ঈমানে যেন প্রবৃদ্ধি ঘটে। প্রতিদিন উন্নতির দিকে ধাবিত হও। আর যখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, তখনি পরিপূর্ণ ঈমানের দিকে অগ্রগামী মু'মিন বলে বিবেচিত হবে আর এর জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা করা জরুরী। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা ইবাদত সমূহের নির্দেশ দিয়েছেন যেন এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং

তাক্ওয়াতে প্রবৃদ্ধি হতে থাকে। প্রত্যেক বছর রোযা-ও, রমযানের মাস-ও এ মুজাহেদার এবং ঈমানে প্রবৃদ্ধির একটি মাধ্যম।

সুতরাং এ উভয় বিষয় থেকে প্রত্যেক মু'মিনের ভরপুর কল্যান লাভের প্রচেষ্টা করা উচিত। আর এ বিষয়ের হিসেব নেয়া যে, ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে আর ঈমানে উন্নতির মান পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা নিদর্শনস্বরূপ বলেন, যদি একনিষ্ঠচিত্তে আমার নিকট আগমন করো, রোযাও আমার উদ্দেশ্যেই রাখো, জাগতিক কোন বিষয় যদি এ রোযার সাথে সম্পৃক্ত না করো কেবল মাত্র আমার সন্তুষ্টি অর্জন-ই উদ্দেশ্য হয়, সেক্ষেত্রে তিনি বলেন, "উজিবু দা'ওয়াতাদ দায়ে ইযা দাআনি" আমি আহ্বানকারীদের উত্তর প্রদান করে থাকি যখন তারা আমাকে আহ্বান করে আর এই আহ্বানের উত্তর তখনই দেয়া হবে যখন ঈমানে উন্নতির প্রচেষ্টা করা হবে এবং উন্নতির দিকে ধাবিত হবে। যাই হোক, দোয়া তখনই গৃহীত হবে যখন ঈমান উন্নতির দিকে ধাবিত হবে আর ঈমানে তখনই প্রবৃদ্ধি ঘটবে যখন একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলীর অনুসরণ এবং তাঁর ইবাদতের চেষ্টা করা হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থলে বলেন, যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তখন আমি তার খুবই নিকটে আছি। আমি আহ্বানকারীদের দোয়া কবুল করি যখন সে আহ্বান করে। অনেকে তাঁর সত্তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। সুতরাং আমার অস্তিত্বের প্রমাণ হলো, আমাকে কাছে আহ্বান করো, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করবো এবং উত্তর প্রদান করবো আর তোমাদেরকে স্মরণ করবো। যদি তোমরা বলো, আমরা ডাকি কিন্তু তিনি উত্তর দেন না তাহলে তোমরা ভেবে দেখ, তোমরা কোন এক স্থানে দাঁড়িয়ে কোন এক ব্যক্তিকে আহ্বান করছ যে তোমাদের থেকে অনেক দূরে। আর তোমাদের নিজেদের কানে সমস্যা আছে। সে ব্যক্তি তোমাদের আওয়াজ শুনে উত্তর দিবে কিন্তু তোমরা নিজেদের বধিরতার কারণে তার কথা শুনতে পাচ্ছ না। সুতরাং তোমাদের অভ্যন্তরের পর্দা যতই দূরীভূত হতে থাকবে তোমরা ততই তাঁর আওয়াজ শুনতে সক্ষম হবে। যেদিন থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি শুরু হয়েছে, এ বিষয়টি প্রতীয়মান হচ্ছে, তিনি তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের সাথে কথোপোকথন করেন। যদি এমনটি না হতো তাহলে ধীরে ধীরে এ বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয়ে যেত যে, তাঁর কোন সত্তা আছে কি নেই? সুতরাং খোদা তাআলার সত্তা প্রমাণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো, আমরা যেন তার আওয়াজ শ্রবণ করি। (ইয়া দিদার ইয়া গুফতার) "হয় সাক্ষাত নতুবা কথোপোকথন" সুতরাং আজকাল কথা বলাই সাক্ষাতের বরাবর। হ্যাঁ যতদিন পর্যন্ত খোদা এবং তার নিকট যাচনাকারীর মাঝে কোন অন্তরায় আছে ততদিন পর্যন্ত আমরা শ্রবণ করতে সক্ষম হবো না। যখন অভ্যন্তরীণ অন্তরায় অপসারিত হবে তখনই তাঁর আওয়াজ শোনা যাবে।

[আল হাকাম, ৮ম খন্ড, ১৯০৪ তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)]।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, তাই এ অভ্যন্তরীণ পর্দা অপসারণের প্রচেষ্টা করুন। তাঁর নিকটবর্তী হবার প্রচেষ্টা করুন। এমনটি যেন না হয়, রমযানে নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করছেন এরপর দূরত্ব এত অধিক হয়ে গেল যে সেই পর্দা এবং অন্তরায় পুনরায় পথের অন্তরায় হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী বছর পুনরায় নতুন ভাবে মোজাহেদার প্রচেষ্টা করা হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ পর্দা আমাদের অপসারণ করার চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা দোয়া কবুলিয়্যতের দৃশ্য সর্বদা অবলোকন করতে পারি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে দোয়া করা হয় সে দোয়া-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর এর মাঝে সবচেয়ে জরুরী দোয়া ধর্মের বিজয়ের দোয়া। মানবজাতিকে খোদার সম্মুখে বিনয়াবনত হতে দোয়া। আঁ হযরত (সা.)-এর পতাকাতলে দুনিয়াকে একত্রিত করার দোয়া। এ দোয়া এমন দোয়া যা খোদা তাআলার ভালবাসাকে আকর্ষনকারী দোয়া। আর যখন এক মু'মিন ব্যক্তি খোদা তাআলার ধর্মের জন্য বেদনা অনুভব করে, এর জন্য দোয়া দ্বারা যাচনা করে তখন খোদা তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর বান্দার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তা পূর্ণ করেন।

সুতরাং বর্তমানে এ দোয়াটি খুব বেশি করা জরুরী যেটি দ্বীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে করা হবে। যা জামাআতের প্রত্যেক সদস্যের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া। আজ রমযানের প্রথম জুমুআ। এ দিনটি বরকতমন্ডিত এবং এ মাসও বরকত মন্ডিত। অর্থাৎ দোয়া কবুলিয়্যতের দুটি

সুযোগ একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলাকে আহ্বান করার এখনি সুযোগ।

হাদীসে আছে,জুমুআর দিন, জুমুআর সময় একটি মুহূর্ত এমন রয়েছে যখন দোয়া কবুলের মুহূর্ত।

(মুসলিম কিতাবুল জুমুআ বাবু ফিস্ সাআতিল্লাতীফি ইয়াওমিল জুমুআ)

এমনও এসেছে, আসর থেকে মাগরিব এর মাঝে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, মুহূর্তে দোয়া গৃহীত হয়। সুতরাং আজকের এ দিনে উক্ত বরকত থেকে সকলের অংশ লাভের চেষ্টা করা উচিত। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কোন নফলের সুযোগ নেই ঠিক-ই কিন্তু যিকরে ইলাহী হতে পারে, এবং অন্যান্য দোয়াও মানুষ করতে পারে। মাসনুন দোয়া রয়েছে বা নিজ ভাষার দোয়াও রয়েছে, এ দোয়া করা প্রয়োজন যেন আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ হয় এবং আমরা যেন দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হই। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানের জামাআতগুলোতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, তার উল্লেখ পূর্বক অনেক বেশি দোয়া করা আবশ্যক কেননা, একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ-ই আমাদেরকে সকল বিপদাবলী থেকে পরিত্রাণ দিবে এবং দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ্।

সতরাং আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিশেষভাবে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের জীবদ্দশায় ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করেন। আমরা অনেক দূর্বল, আমাদের দূর্বলতা যেন দূর করেন। আমাদের গাফিলতি যেন প্রকাশ না করেন। আমাদেরকে তাঁর নৈকট্যের পথ যেন প্রদর্শন করেন। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন-ই আমাদের উদ্দেশ্য বানিয়ে দিন এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনে আমরা যেন সক্ষম হই। আমরা অনেক দূর্বল, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি "নুসিরতু বিররু'বি" ভয়ভীতি থেকে তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে–এর থেকে আমরাও যেন অংশ লাভ করি। শত্রুর বিরুদ্ধে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতাপের দৃশ্য আমরা যেন সর্বদা প্রত্যক্ষ করতে থাকি।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর (আ.) সত্তার সাথে বিদ্রুপকারীদেরকে তিনি লাঞ্ছনার শেষ সীমায় পৌঁছাবেন আর তাঁকে (আ.) ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন, "ইন্না কাফাইনাকাল মুসতাহ্যিঈন" যারা তোমার সাথে বিদ্রূপ করে আমি তাদের জন্য যথেষ্ট। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যখনই বিদ্রূপাত্মক আচরণ করার অথবা ঠাট্টা তামাশা করার চেষ্টা করেছে এবং এর ফলে শত্রুর যে কী পরিণাম হয়েছে তার দৃশ্য আমরা সর্বদা দেখেছি এবং শুনেছিও। কিন্তু আমাদের দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো আমাদের দূর্বলতা এবং ভুল ত্রুটির কারণে খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার দিন যেন বিলম্ব না হয়।

আমাদের দূর্বলতা যেন শত্রুকে তামাশা করার সুযোগ না দেয়। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কারণে আমাদেরকে নিজ প্রতাপ এবং বিশালত্বের দৃশ্য যেন অবলোকন করান। আঁ হযরত (সা.)-এর বড়ত্ব এবং সম্মানকে আমরা যারা মসীহ্ মাহদীর গোলাম রয়েছি, আমাদেরকে প্রকৃত মডেল গোলামে পরিণত করে আমাদের জীবনে দুনিয়ার প্রত্যেক শহর এবং প্রতিটি অলিগলিতে প্রতিষ্ঠিত হতে যেন দেখান। আমাদের দূর্বলতা, আমাদের প্রতিবন্ধকতা, আমাদের অলসতা যেন কখনো আমাদেরকে খোদা তাআলার আশীষসমূহ থেকে বঞ্চিত না করে। আল্লাহ্ তাআলা কেবল নিজ অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের দূর্বল শরীরে সেই শক্তি প্রদান করুন যার ফলে আমরা তাঁর দ্বীনের আযমতের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকি। আল্লাহ্ তাআলা নিজ মহব্বত আমাদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করুন যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূল (সা.) আশা করেন। যার জন্য আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন–**"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাল ইউহিব্বুকা ওয়াল আমাইল্লাযী ইউবাল্লিগুনী হুব্বাকা- আল্লাহুমাজ আল হুব্বাকা আহাববা ইলাইয়া মিন নাফসী ওয়া মালী ওয়া আহলী ওয়া মিনাল মায়ীল বারিদ।"**

(জামে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

হে খোদা! আমি তোমার নিকট তোমার ভালবাসা যাচনা করি এবং তার ভালবাসাও যে তোমাকে ভালবাসে এবং এমন আমল যাচনা করি যা তোমার ভালবাসা অর্জনের মাধ্যম হবে। হে খোদা! আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা সৃষ্টি করো এমন ভালবাসা যা আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় হবে,

আমার সম্পদের চেয়ে বেশী প্রিয় হবে, আমার পরিবারের চেয়ে অধিক প্রিয় হবে এবং ঠান্ডা পানির তুলনায় অধিক প্রিয় হবে।

সুতরাং এ ভালবাসা আমাদের প্রত্যেক কর্মকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিবে। আল্লাহ্ তাআলার সমস্ত নির্দেশের প্রতি আমরা তাঁর মহব্বতের খাতিরে আমলকারী হবো। আল্লাহ্ করুন, আমরা নিজেদের মনের আকাঙ্ক্ষা সমূহ খোদা তাআলার মহব্বতের কারণে নিবারণকারী যেন হই। সম্পদের প্রতি ভালবাসা কখনো যেন আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত থেকে গাফেল না করে। স্ত্রী, সন্তান, নিকটাত্মীয়ের মহব্বত আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসায় আমাদেরকে গাফেল যেন না করে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেন, **"লা তুলহিকুম আমওয়া লুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিক্‌রিল্লাহ্।** *(মুনাফেকূন ঃ ১০)* অর্থাৎ তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানগণ আল্লাহর যিক্‌র হতে তোমাদেরকে গাফেল যেন না করে।" আর আখেরীনদের যুগে এটি অধিক হবার ছিল। এরপর জগতের লালসা সম্পদের লালসা এবং এর নতুন নতুন পথ আবিষ্কার হবার ছিলো। সুতরাং এ যুগে ঐ সমস্ত কিছু থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা সমস্ত কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া এমন যা আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্যে ভূষিত করে।

এরপর এ দোয়াতে ঠান্ডা পানির উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এমন এক পিপাসার্ত যে পানি খোঁজ করছে এবং কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। অজ্ঞান হবার অবস্থায় উপনীত হলো। সে মুহূর্তে সে এক ঢোক পানির জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু এক প্রকৃত মু'মিনকে আঁ হযরত (সা.) দোয়া শিখিয়েছেন, যে সময় যখন তোমরা পানির এক সামান্য অংশ পেয়ে যাও, তা তোমরা যত বড় নেয়ামত মনে করো, ঠান্ডা পানির একটি সামান্য অংশ তোমাদের নিকট কত বড় নেয়ামত মনে হয়! তিনি (সা.) উক্ত দোয়া করে আমাদের সামনে তার উত্তম হওয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর কেবল দোয়া-ই করেননি বরং নিজ আমল দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সুতরাং এ দিনগুলোতে ধর্মের শির সুউচ্চ করার লক্ষ্যে, আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে আঁ হযরত (সা.)-এর পতাকা জগতে প্রোথিত করতে একনিষ্ঠচিত্তে দোয়া করুন এবং সাথে সাথে আমরা যখন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের দোয়া করবো তখন এ দোয়া আমাদেরকে খোদা তাআলার নিকটবর্তী করবে। আমাদেরকে তা তাকওয়ায় প্রবৃদ্ধি সৃষ্টিকারী হবে। যদি এ রমযানে আমাদের প্রত্যেকে এ উদ্দেশ্যকে অর্জন করে নেয়। আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য এবং ভালবাসা অর্জন করে নেয়। তাক্‌ওয়ায় উন্নতিকারী হয়ে যায় তখন **"ইন্নি কারিব"** এর আওয়াজ শ্রবণকারীতেও পরিণত হবে এবং **"উজিবু দাওয়াতাদ্ দায়ে ইযা দাআন"** এর দৃশ্যও অবলোকনকারীতে পরিণত হবে। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা **"লাআল্লাহুম ইয়ারসুদূন"** অর্থাৎ 'যেন তারা হেদায়াত পায়' বলে এ কথা ঘোষণা করছেন অর্থাৎ যখন নেক আমল হবে, ঈমানে উন্নতি হবে, দোয়ার দিকে মনযোগ নিবদ্ধ হবে তখন সে মু'মিন হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যাবে আর হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা হলো, তিনি এমন প্রত্যেক একনিষ্ঠ বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন।

সুতরাং হে মসীহ্ মাহদীর গোলামগণ! তাঁর বৃক্ষের সবুজ ডালপালাগণ! হে ঐ সকল লোক! যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সুদৃঢ় হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। হে ঐ সকল লোকেরা! যারা এ মুহূর্তে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে নিজ জাতির যুলুমের কারণে মজলুমের দিন অতিবাহিত করছেন, আর মজলুমদের দোয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, আমি তা অধিক শ্রবণ করি। তোমাদেরকে খোদা তাআলা সুযোগ দিয়েছেন, অর্থাৎ এই রমযানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠচিত্তে আর এ সকল কথার দোহাই দিয়ে, আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়ার মাধ্যমে অতিক্রম করো। এই রমযান খিলাফতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম রমযান। আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেদের সিজদাসমূহ এবং দোয়া সমূহের মাধ্যমে নতুন পথ নির্ধারণ করার রমযান বানিয়ে নিন। নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করার রমযান বানিয়ে নিন। নিজেদের চোখের পানি দ্বারা সেই ঝড় সৃষ্টি করুন যা শত্রুকে সমস্ত ষড়যন্ত্র সহ খড়কুটার ন্যায় বইয়ে নিয়ে যায়। নিজেদের দোয়ায় ঐ কম্পন সৃষ্টি করুন যা খোদা তাআলার মহব্বতকে ধারণ করতে থাকে কেননা মসীহ্ মাহদীর সফলতার মূলমন্ত্র কেবল দোয়ার মাঝে।

খোদা তাআলা এ দিনগুলোতে ৭ম আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করেন। আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কোলে আশ্রয় দিন এবং আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে দেয় প্রতিশ্রুতি আমরা যেন আমাদের জীবদ্দশায় দেখতে পারি। হে আল্লাহ্ তুমি এমনটাই করো। আমীন।

অনুবাদ ঃ **শেখ মোস্তাফিজুর রহমান** (পলাশ)

মুরব্বী সিলসিলাহ্

কুরআন আমার প্রিয় কুরআন

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

(৭ম কিস্তি)

কিস্‌সে ইস নূর কি মুমকিন হো জাহাঁ মেঁ তাশবীহ্

ওহ্ তো হার বাত মেঁ হার ওসফ মেঁ য়াকতা নিকলা।

[জগতে কিসের সাথে এ জ্যোতির সাদৃশ্য বর্ণনা সম্ভব হতে পারে?

(আসলে) এ তো প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক গুণে দৃষ্টান্তবিহীন প্রতিপন্ন হয়েছে - দুর্‌রে সামীন।]

কুরআন করীমের শিক্ষা বিজ্ঞান থেকে আলাদা নয় আর এর পরিপন্থীও নয়। কেউ কেউ মনে করেন, কুরআনের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের মাঝে সংঘাত রয়েছে। আসলে না বুঝার দরুন এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন যে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ বিজ্ঞানও, যা সেই মহা মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত। আল কুরআন আল্লাহ্‌র বিধান এবং বিজ্ঞান হলো তাঁর কর্ম। বিজ্ঞানের বিষয়াদি বুঝলে যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় তেমনি কুরআনি বিধিবিধান সঠিকভাবে পালন করলে আল্লাহ্‌র সত্তা তাঁর বাক্যালাপ ও কথোপকথোনের মাধ্যমে তিনি বান্দার কাছে ধরা দেন। এখন আমরা বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয় উল্লেখ করে দেখাতে চেষ্টা করবো সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ অনেক আগেই কুরআনে এসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যা বিজ্ঞানীরা কেবল কয়েক শতাব্দী আগে মাত্র জানতে পেরেছে। মানুষ যতই নিজেকে জ্ঞানী ভাবুক না কেন কুরআনের জ্ঞান ভান্ডার অন্বেষণ করলে দেখা যাবে মহান আল্লাহ্ সুবহানু ওয়া তাআলা অনেক আগেই এসব কুরআনে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। মোট কথা কুরআন করীম পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সহ জীবনের যত দিক হতে পারে সব একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে ঃ

বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব

আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তিনি বলেন, 'কুন' অর্থাৎ হও, 'ফা ইয়াকুন' অর্থাৎ তা হতে আরম্ভ করে এবং হয়েই থাকে। তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর একটি নিয়ম আছে। প্রথমেই ধরা যাক বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্বের কথা। এ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রূপ কথা প্রচলিত আছে। কেউ তো বলে ব্রহ্মার অন্ডকোষ থেকে নাকি এ বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর নাম ব্রহ্মান্ড। বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে ৩টি বৈজ্ঞানিক মতবাদ পাওয়া যায় : (১) Steady State Theory বা স্থির অবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব। এ অনুযায়ী বিশ্ব সব সময় একই হারে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং অবিরতভাবে নতুন নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

(২) মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory)। এ অনুযায়ী বিশ্ব সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল একটি বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে এবং গ্যালাক্সিগুলো (অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের সমষ্টি হলো একটি গালাক্সি) অনির্দিষ্ট কাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে এবং কখনোই এগুলো কল্পিত কোন কেন্দ্র বিন্দুতে ফিরে আসবে না।

(৩) স্পন্দমান বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব (Pulsating Universe Theory)। এ অনুযায়ী কোন সুসংবদ্ধ স্তুপীকৃত বস্তুরাশি থেকে সব পদার্থ বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং এসব ছুটন্ত পদার্থের গতি যথা সময়ে কমতে থাকবে, ক্রমান্বয়ে পারস্পরিক অভিকর্ষ বলের প্রভাবে এরা নিশ্চল এবং সংকুচিত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুবে যখন পুনরায় বিস্ফোরিত হয়ে আবার বিভিন্ন দিকে ছুটতে থাকবে–এভাবে সৃষ্টি পদ্ধতি চলতেই থাকবে।

বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে কুরআনের প্রথম ভাষ্য হলো- "যারা অস্বীকার করছে তারা কি দেখেনি যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়েই সংবদ্ধ (পিন্ডাকারে) ছিল? এরপর আমরা উভয়কে চিরে ফেড়ে পৃথক করে দিলাম। আর পানি থেকে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না" (সূরা আম্বিয়া : ৩১)।

এ আয়াত থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে জানতে পারি। মনে হয় এতে বিশ্বের ভূতপূর্ব অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে গোটা বিশ্ব বিশেষ করে সৌর জগৎ এক সংবদ্ধ অবয়বহীন অবস্থা অর্থাৎ নিহারিকাবৎ পদার্থ-পিন্ড হতে বিবর্তন লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাতে প্রাকৃতিক যে গতিসঞ্চার করেছিলেন সেই অনুযায়ী বস্তু পিন্ডকে বিযুক্ত করে দিলেন। এর বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলো সৌর জগতের অংশ হিসেবে রূপ নিল (The Universe Surveyed by Harold Richar & The Nature of the Universe by Fred Hoyle (–বাংলা কুরআন মজীদ থেকে)। কুরআন আরও বলে, "নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকশসমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এরপর তিনি আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন....." (সূরা আ'রাফ : ৫৫)।

এখানে 'ইয়ওমা' বা দিন শব্দ দিয়ে ২৪ ঘন্টার দিবারাত্র বুঝায় নি। বরং এতে

ছয়টি পর্যায় বুঝিয়েছে। আর এ পর্যায়গুলো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ব্যপ্ত বললেও আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই। বিজ্ঞান এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান আকারে আসতে– বিবর্তিত হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী হযরত মুহিউদ্দীন আল আরাবী (রহ.)-এর কাশফ ও দিব্যদর্শন যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে উপরোক্ত অভিন্ন সিদ্ধান্তেই উপনীত করে।'

উপরোক্ত ছয়টি পর্যায় সম্বন্ধে কুরআন করীমের সূরা হামীম আল্ সিজদার ১০-১৩ আয়াত, সূরা আম্বিয়ার ৩১-৩৪ আয়াতগুলোতে সেই বর্ণনা রয়েছে। এর আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ

প্রথম পর্যায়–'দুখান' বা আকারবিহীন ধূম্রের ন্যায় পদার্থের অবস্থা;

দ্বিতীয় পর্যায়– ক্রমবিবর্তিত আকার বিশিষ্ট মহাকাশ (আকাশসমূহ যা ৭টি স্তরে বিভক্ত) এবং সৌর জগৎ;

তৃতীয় পর্যায়–আকারহীন পৃথিবীর বায়বীয় অবস্থা,

চতুর্থ পর্যায়–আকৃতি বিশিষ্ট পৃথিবীর ক্রমবিবর্তিত অবস্থা;

পঞ্চম পর্যায়–পৃথিবীতে পর্বতমালা নদনদী ইত্যাদির অবস্থা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আবির্ভাব।

কুরআন করীমের এ পর্যায়গুলোর বর্ণনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সৃষ্টির রহস্যকে উপলব্ধি করার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসল কথা এই পবিত্র কুরআন প্রায় ১৫০০ বছর আগে এসব তত্ত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। (জনাব খলীলুর রহমান সাহেবের 'পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ নেয়া হয়েছে)।

মানব সৃষ্টি তত্ত্ব

মানব সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মতামত রয়েছে। সাধারণত বিশ্বাস করা হয় আদম প্রথম মানুষ। কিন্তু কুরআন করীমে তাঁকে 'খলীফা' বলা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ৩১ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন : **ইন্নী জায়িলুন ফিল আরযে খলীফা** অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে খলীফা বানাতে যাচ্ছি। তখন যদি আরও মানুষ না থাকতো তাহলে তিনি কাদের খলীফা হতেন? সুতরাং এখানে যে আদমের কথা বলা হয়েছে তিনি প্রথম মানুষ নন তিনি প্রথম খলীফা ও নবীউল্লাহ্। এর আরও অনেক প্রমাণ দেয়া যায় কুরআন থেকে। এ আদম হলেন প্রায় ৭ হাজার বছর আগের প্রথম সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষটি এবং প্রথম নবী–সেই সময়ের মানুষদের হেদায়াতদাতা নবী। হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবীর এক কাশ্‌ফে তিনি এমন এক আদমের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন যিনি ৪০,০০০ বছর আগের আদম। অতএব, বিভিন্ন যুগ পর্যায়ে বিভিন্ন আদমের কথা জানতে পারা যায়। মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, মানুষকে পানি থেকে, বীর্য থেকে, মাটি ও খনখনে শুকনো মাটি থেকে, তাড়াহুড়ো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিয়ে মানুষের প্রথম সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং তার স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যেসব বিষয় খুব গুরুত্ব বহন করে তাহলো :

ওয়াল্লাহু আমবাতাকুম্‌মিনাল আরযি নাবাতান অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেছেন গাছের ন্যায় (সূরা নূহ ঃ ১৮)

ওয়া লাক্বাদ খলাক্বনাল ইনসানা মিন সালসালিম্মিন হামাইম্মাসনূন অর্থাৎ, আর নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সৃষ্টি করেছি (খনে খনে) শুষ্ক কাদা অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হতে বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল (সূরা হিজর : ২৭)।

উপরোক্ত আয়াত দুটো থেকে আমরা জানতে পারি প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ গাছের ন্যায় মাটি থেকে উদ্গত হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে 'সাল সাল' অর্থাৎ (খনে খনে শুকনো কাদা) এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, মানুষকে এমন এক জড় পদার্থ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যার মাঝে কথা বলার শক্তি গুপ্ত ও সুপ্ত রয়েছে। এথেকে প্রমাণিত হয় ঐশী ডাকে সাড়া দেয়া বা প্রতিক্রিয়া দেখানোর গুণ দিয়ে মানুষকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে। 'হামা'–পচা কাল কাদা শব্দটি এটা ব্যক্ত করেছে যে মানুষকে কাল কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মাটি দেহের অধিকরণ ও পানি আত্মার উৎস। কুরআন করীমের অন্য স্থানে মানুষকে পানি ও মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে। (৩ঃ৬০ ও ২১ : ৩১)। 'সাল সাল' শব্দ 'হাম' শব্দের সাথে সংযুক্ত করে কুরআন করীম এ মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছে, যেখানে অন্যান্য সজীব প্রাণীর সৃষ্টি শুধু 'হাম' অর্থাৎ মাটি ও পানি হতে, কারণ এদেরও এক প্রকার অপরিণত আত্মা রয়েছে, সেখানে 'হাম' ও 'সাল সাল' যুক্ত হয়ে বাক্ শক্তি গুণসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। একে 'মাসনূন'ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ যার ওপর দিয়ে দীর্ঘ এক কাল অতীত হওয়ার ফলে এর আকৃতি প্রকৃতি বদলে গছে। কুরআন বার বার ঘোষণা করছে, ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টি। এ আয়াত মানব সৃষ্টির কেবল প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। অন্যান্য স্তর সম্পর্কে কুরআনের ৩০ : ২১, ৩৫ : ১২, ২২: ৬, ২৩ : ১৫ এবং ৪০ : ৬৮

আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে কুরআনে ডারউইনের Theory of Evolution-এর কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ মানুষ বানর থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন এ বিবর্তনবাদ মানে না। এর আলোচনায় আর এখন যাচ্ছি না।

কুরআনের আলোকে যা বুঝা যায় তা হলো, লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর ওপরিভাগে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন কোন জলাশয়ের পানি পচে গেলে সেখানে নানা রকম নতুন নতুন পোকা মাকড়ের সৃষ্টি হয় বা কোন স্থানে নতুন মাটি ফেলা হলে সেখানে নানা রকম নতুন নতুন গাছগাছড়ার জন্ম হয় তেমনি সেই পরিবেশে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উদ্ভিদের ন্যায় মানবজাতির সৃষ্টি হয়। যেন পৃথিবী একটি মাতৃ জঠরে পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের পরিবর্তনের ফলে এ প্রজাতি মানুষের আকৃতিতে পরিণত হয় এটা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক আগের কথা। আমরা মানব সভ্যতার গোড়ার কথা জানতে পারি যখন মানুষ প্রস্তর যুগে আগুনের ব্যবহার শিখেছিলো। এরপর আসে লৌহ যুগ, তাম্র যুগ প্রভৃতি। এরপর মানুষ যখন কথা বলতে শিখলো, ভাষা ইত্যাদি শিখলো তখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে আবির্ভূত হলেন আল্লাহ্‌র প্রথম নবী ও খলীফা হযরত আদম (আ.)। এভাবেই দীর্ঘ দিন ধরে মানব সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ ঘটে চলেছে।

সত্যি কথা বলতে কি এখনও মানুষের জন্ম মাটি থেকেই হয়ে থাকে। মানুষের রক্ত, বীর্য প্রভৃতি মাটি থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের নির্যাস ছাড়া আর কিছুই নয় (এর কোন কোন অংশের জন্যে বাংলা কুরআন মজীদের সাহায্য নেয়া হয়েছে)।

মহাকাশে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনী ভাষ্য

মহাকাশে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আজকের বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত। কেউ বলেন, মহাশূন্যের গ্রহাদিতে জীবনের অস্তিত্ব আছে আর তা প্রমাণের জন্যে বিজ্ঞানীরা চেষ্টাপ্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য আর একটি দল বলছে, মহাশূন্যে জীবের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কুরআন করীমের বহু আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে মহাকাশে যূল-উকুল বা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন সূরা রা'দের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে–ওয়া লিল্লাহি ইয়াসজুদু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি তাওআঁ ওয়া কারহাঁ ওয়া যিলালুহুম বিল গুদুবুবি ওয়াল আসাল অর্থাৎ, আর যারা আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবীতে আছে তারা ও তাদের ছায়া স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে সিজদা করে। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এ আয়াতে ব্যবহৃত 'মান' শব্দ কেবল মাত্র জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এতে বুঝা যায়, মহাকাশে জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের অস্তিত্ব আছে। সেদিন বেশি দূরে নয় মানুষ মহাকাশে ভিন্ন গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান লাভ করবে। বলা বাহুল্য, অধুনা বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রায় ৩শ গ্রহের সন্ধান লাভ করেছেন। পৃথিবীর সাথে এগুলোর অনেক দিক থেকে মিল রয়েছে। বিজ্ঞানীরা ষাট ভাগ নিশ্চিত যে মহাকাশে জীবের অস্তিত্ব রয়েছে (বিবিসি ভাষ্য)। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) ২২-১১-৯৫ তারিখের এক আলোচনায় বলেছেন, পৃথিবী ছাড়া বিশ্ব জগতের অন্যত্র কোথাও চিন্তাশীল জীবের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।' এ প্রসঙ্গে সূরা আর রহমানের ৩০ ও সূরা শূরার ৩০ আয়াতের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। 'এমন এক সময় আসবে (সম্ভবত) যখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ও অন্যান্য গ্রহ-গ্রহান্তরের বসবাসকারীদের সংযোগ স্থাপিত হবে এবং তারা একত্র হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ১২,০০০ বছর পূর্বে আকাশ থেকে অতিথিরা (দ্রোপাস) পৃথিবীতে এসেছিল (দি পাকিস্তান টাইমস, ১৩-৮-৬৭' (বাংলা কুরআন মজীদ দ্রষ্টব্য)।

মধ্যাকর্ষণ শক্তি (Law of Gravitation)

মহান আল্লাহ্ তাআলা সূরা রা'দ-এর ৩নং আয়াতে বলেছেন, আল্লাহু ল্লাযী রাফাআস্ সামাওয়াতি বিগায়রি 'আমাদিন তারাওনাহা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই স্তম্ভ ছাড়া আকাশসমূহ উন্নত করেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ....' মহা বিশ্বের রহস্যাবলীর মাঝে সবচেয়ে মৌলিক বিষয়টির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হলো মধ্যাকর্ষণ শক্তির (Law of Gravitation) তত্ত্ব কথা। বলা হয়েছে, আকাশ ও পৃথিবীর বস্তু নিচয় নিজে নিজেই স্থিতিশীল হয় নি। বরং সব মহাকাশীয় বস্তু একটি গুপ্ত আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে পরস্পরকে আকর্ষণ করে নিজ নিজ অবস্থানে রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর উপরিভাগে মানবসহ যা কিছু রয়েছে । তা-ও পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির কারণে এর গায়ে লেগে রয়েছে। এ শক্তিই হলো মধ্যাকর্ষণ শক্তি। আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে কুরআনে এ তত্ত্বের কথা আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন। এ শক্তি সারা বিশ্বের ভার সাম্য রক্ষা করছে। এ

শক্তি যদি না থাকতো তাহলে বিশ্বের সব কিছু লন্ড ভন্ড হয়ে যেতো। অথচ মানুষ এ শক্তির কথা জানতে পারলো কেবল ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটনের মাধ্যমে। সুতরাং কুরআন যে মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলার ঐশী কিতাব তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কুরআন করীমের ৭ ঃ ২৬, ২০ ঃ ৫৬ এবং ৭৭ ঃ ২৬-২৭ আয়াতগুলোতেও এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত রয়েছে। গবেষণাকারীরা গবেষণা করে দেখতে পারেন।

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে না সূর্যই ঘোরে?

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে না সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে বহু কাল ধরে এ নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। আজ থেকে প্রায় ১৫শ বছর আগে কুরআন করীম বলে দিয়েছে – **ওয়া সাখ্খারাশ্ শামসা ওয়াল ক্বামার– কুল্লু তাজরী লি আজালি মুসাম্মা.....** অর্থাৎ, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) সেবায় নিয়োজিত করলেন, প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষ পথে) গতিশীল (সূরা রা'দ ঃ ৩ আয়াতাংশ)। আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলা আরও বলেছেন, **কুল্লু ফী ফালাকিঁ ইয়াসবাহূন** অর্থাৎ, আর তাদের প্রত্যেকেই আকাশ পথে নিজ নিজ কক্ষ পথে অবাধে সাঁতার কেটে চলছে (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪১)। এসব আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায়, আকাশে গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি যেসব বস্তু রয়েছে তারা নিজ নিজ গতি পথে নির্দিষ্ট সময় ধরে গতিশীল রয়েছে তাই এ ঘুর্ণনকালে কেউ কারো চতুর্দিকেও ঘুরে আসতে পারে। এতে এটা বলা যায় না যে এটা ওটার চারিদিকে ঘুরছে। অতএব কুরআন করীম যে তথ্য উপস্থাপন করেছে অর্থাৎ সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষ পথে এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রদক্ষিণ করে, এটাই যথার্থ। এ নিয়ে মতভেদের অবকাশ নেই।

পৃথিবী গোলাকার

জ্যোতির্বিদ্যা থেকে জানা যায়, প্রথম অণু পরমাণু সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই অণু পরমাণু জড়ো বা একত্র হতে থাকে এবং কেন্দ্রে অণু পরমাণুর এক ভীড় জমে যায়। পরে তা ঘুরতে থাকে আর ঘূর্ণনের ফলে আশে পাশের যে অণু পরমাণু এর সাথে ধাক্কা লাগে এবং সেগুলো দূরে সিট্‌কে পড়ে এবং বায়ু তাড়িত হওয়ার কারণে ওগুলোতে তাপ ও বাষ্প সৃষ্টি হয়। পরে বৃষ্টি এসে এগুলোকে ঠান্ডা করে। এভাবে একটি গোলকাকৃতি পি- সৃষ্টি হয়। এথেকে আমরা জানতে পারলাম কোন পদার্থ ঘুরতে থাকলে তা গোলাকৃতিতে পরিণত হয়। আমরা সুরা আম্বিয়ার ৩১ আয়াতের আলোকে আগেও আলোচনা করে এসেছি যে পৃথিবী ও আকাশ সংবদ্ধ ছিল এবং একে চিরে ফেড়ে পৃথক করা হয়। পরে সেই অংশগুলো ঘুরতে থাকে এবং গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এভাবে আমরা দেখি প্রায় সব গ্রহ উপগ্রহই গোলাকার। আমাদের পৃথিবীও গোলাকার। কুরআন করীমের এ আয়াত থেকেও আমরা গোলার্ধ এবং গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পেয়ে থাকি–**রব্বুল মাশরিকায়নি ওয়া রব্বুল মাগরিবাইন** অর্থাৎ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ দুটি পূর্বের এবং দুটি পশ্চিমেরও আল্লাহ্ (৫৫ ঃ ১৮ ও ৭০ ঃ ৪১)। অতএব আজ থেকে প্রায় ১৫শ বছর আগে কুরআন করীম পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

খ্রিষ্টান প্রাদ্রীরা বিশ্বাস করতো, পৃথিবী সমতল। তাই সপ্তদশ শতকে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যখন বললেন, পৃথিবী গোলাকার তখন পাদ্রীরা অনেক হাসি-ঠাট্টা করলো, তারা বললো, পৃথিবী গোলাকার হলে পৃথিবীর অপরদিকের লোকগুলোর পা আকাশে দিকে এবং গাছ পালার গোড়া শূন্যে ঝুলে থাকবে নাকি? পরে তারা তাঁকে ভয়-ভীতি দেখালো। গ্যালিলিও পাদ্রীদের কুফরীর ফতোয়ার ভয়ে তখনকার মত চুপ থাকলেন। হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.)-এর এক শিষ্যের সাথে কলম্বাসের বন্ধুত্ব ছিল। মুসলমান মনীষীরা কুরআনের আলোকে বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী গোলাকার। তাই কলম্বাস তার বন্ধুর কাছ থেকে একথা শুনে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ভারত বর্ষে আসার পরিকল্পনা করলেন। উল্লেখ্য, তখনকার দিনে মুসলমানরা ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশ থেকে মালামাল নিয়ে ইউরোপের বাজারে বেচাকেনা করতো। এসব দেখেই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে আসার স্বপ্ন দেখতো। কথা প্রসঙ্গে এটাও বলা যায়, ইউরোপের লোকদের শূন্য সংখ্যাটির ধারণা ছিল না। এটা ভারতীয়দেরই জানা ছিল। মুসলমানরাই ইউরোপীয়দের কাছে এ শূন্যের ধারণা পৌঁছে দেয়। আর এ শূন্য অঙ্ক শাস্ত্রের জন্যে যে কত প্রয়োজনীয় তা বলে শেষ করা যায় না। সে যা-ই হোক কলম্বাস স্পেনের রাণী ইসাবেলার এ ভ্রমণের প্রস্তাব দিল। পাদ্রীরা অনেক আপত্তি তুললো পরিশেষে কলম্বাস কোনভাবে রাণীর সাহায্যে আটলান্টিক পাড়ি দিলেন। তখনও এটা জানা ছিল না যে মাঝখানে রয়েছে এক বিরাট মহাদেশ আমেরিকা। একদিন কলম্বাস আমেরিকার পূর্বাংশে গিয়ে পৌঁছেন এবং ভারত বর্ষ মনে করে এর নাম রাখেন ওয়েষ্ট ইন্ডিজ। এর অনেক পরে

ওলন্দাজ পর্যটক ভাস্কো ডাগামা আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে একদিন সেই স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছেন। এর মাঝে আমেরিগো ভেশপুচি ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। অতএব পৃথিবী যে গোলাকার এর সংবাদ সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অনেক আগেই দিয়ে রেখেছিলেন।

সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুরই জোড়া আছে

মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের সূরা ইয়াসীনের ৩৭ আয়াতে বলেন ঃ

সুবহানাল্লাযী খলাক্বাল আজওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্বিতুল আরযু ওয়া মিন আনফুসিহিম ওয়া মিম্মা লাই য়া'লামূন

অর্থাৎ পবিত্র তিনি, যিনি সবকিছুকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন, যা ভূমি উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাদেরকেও, আর তাদেরকেও যা তারা জানে না।

এটা আজ এক অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে প্রত্যেক বস্তুর জোড়া রয়েছে। জীবজন্তু গাছপালা শাক-সব্জি, ফল ফলাদির জগতে যেমন রয়েছে তেমনি অজৈব পদার্থেরও জোড়া রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, তিনি একটি বইয়ে পাঠ করেছেন, টিনের মাঝেও যে স্ত্রী পুরুষ রয়েছে এতে তা বলা হয়েছে। এমনকি যেগুলোকে আমরা মৌলিক পদার্থ বলে জানি সেই একক পদার্থটিও একা অস্তিত্বশীল নয়। এরও জোড়া রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় কোন কোন প্রাণী উভয় লিঙ্গ। একদিকে পুরুষ এবং অন্যদিকে স্ত্রী। এমন কি মানুষ যে যন্ত্রাদি তৈরী করেছে এর মাঝেও জোড়া রয়েছে, যেমন লাইনার পিষ্টন ইত্যাদি। একথা বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখন মানবের বুদ্ধির সাথে ঐশী বাণীর মিলন ঘটে তখন সত্যিকারের অভ্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। এরকম আরও উদাহরণ দেয়া যায়।

এর কারণ কি? এর কারণ হলো, এটা প্রমাণিত হওয়া যে সব কিছু জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেবল মাত্র মহান আল্লাহ্র সত্তাই এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশ বা জোড়া নেই। তৌহীদের এই মূল বিষয়টি বুঝানোর জন্যেই সৃষ্টির মাঝে এ তত্ত্বটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, 'সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমরা সব কিছু জোড়া জোড়া বানিয়েছি। এ জ্ঞানও কুরআন করীম ছাড়া প্রথমে আর কারও জানা ছিলো না। গোটা বেদ পাঠ কর। সারা বাইবেল পাঠ কর। সবটা ইঞ্জিল পাঠ করে দেখ। গোটা যিন্দাবেস্তা পাঠ করে দেখ। গ্রীক দর্শনের পুস্তকাদি পাঠ করে দেখ। ভারতীয় দার্শনিকদের পুস্তকাদি পাঠ কর। চীনের কনফুসিয়াস নবীর গ্রন্থাদি পাঠ করে দেখ। জাপানের শানটোইজম নামে যে ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে এর পুস্তকাদি পাঠ করে দেখ। বৌদ্ধদের পুস্তিকাদিও পাঠ কর। ইহুদীদের বইগুলি পাঠ কর। খ্রিষ্টানদেরগুলোও পড়। হিন্দুদেরগুলোও পড়। গ্রীকদেরগুলোও পড়। যে কোন ধর্মের পুস্তক পাঠ কর। প্রত্যেক বস্তুর যে জোড়া আছে এ তত্ত্ব তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না। কেবল কুরআন করীমই এমন এক কিতাব যা বলে, আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়া জোড়া বানিয়েছি। আর এর জোড়া এজন্যে বানিয়েছি যেন এর প্রজ্ঞার মাধ্যমে খোদার তৌহীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।' (সয়রে রূহানী)।

বর্তমান কালে মানুষের জ্ঞান এ ব্যাপারে অনেক বেড়ে গেছে। কৃষি কাজে মানুষ অনেক উপকৃত হচ্ছে। পরাগায়ন এর মাধ্যমে ফলন বাড়ছে। ফল বাগানে মৌমাছির চাষ করা হচ্ছে যাতে ফুলের মঞ্জরীতে স্ত্রী পুরুষ পরাগায়নের মাধ্যমে ফলফলাদির ফলন অনেক বেশি হয়। আর মধুটা কেবল অতিরিক্ত লাভ হচ্ছে। অতএব কুরআন করীমই এমন এক পুস্তক যাতে জোড়া জোড়া সৃষ্টির উল্লেখ করে এসব জ্ঞানের অর্গল খুলে দিয়েছে।

পৃথিবীর লয় প্রাপ্তি

কুরআন করীম অবতরণকালীন সময় মানুষ বিশ্ব জগতের রহস্যাবলী সম্বন্ধে খুব কমই জানতো। বর্তমানে এর বিষয় সম্বন্ধে মানুষ অনেক বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে আর কোন কোনটি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকারে রয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে বিশ্ব জগৎ প্রায় আলোর গতিতে ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রথমে এডউইন হাবেল ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। অথচ আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলে রেখেছেন ঃ ওয়াস্ **সামায়া বানাইনাহা বিআয়দিন ওয়া ইন্না লামু'সিউন** অর্থাৎ, আর এই যে আকাশ – আমরা একে আমাদের হাতে (অর্থাৎ শক্তি দিয়ে) সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী (সূরা যারিয়াত ঃ ৪৮)। মু'সিউন অর্থ সম্প্রসারণ করতে থাকবো। প্রসঙ্গত বলা যায়, অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে এ সম্প্রসারণের কথা বলা দূরে থাকুক কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত দেয়া হয় নি।

এরপর কুরআন করীম বলে দিয়েছে যে এমন একদিন আসবে যখন গোটা বিশ্ব জগত একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলে ঃ **ইয়াওমা নাত্বিস্ সামায়া কাত্ত্বায়্যিস্ সিজিল্লিল কুতুব**–অর্থাৎ, যেদিন আমরা আকাশকে গুটিয়ে নিব বই খাতাদির লিখিত বস্তুকে গুটিয়ে নেয়ার ন্যায় (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)। এতে বুঝা যায় এ বিশ্ব জগৎ চিরস্থায়ী নয়। এটা যেন বিজ্ঞানীদের ভাষায় এ রকম যে সব কিছু একটি 'ব্লাক হোল' (অন্ধ কূপ)-এ প্রবেশ করবে। এটাই হয়তো হবে বিশ্বের মহাপ্রলয়। এ প্রসঙ্গে এখনও গবেষণা চলছে। মানুষের জানার আরও অনেক বাকী আছে। কুরআন করীমে এসব ব্যাপারে এখনও আরও অনেক কিছু প্রচ্ছন্ন আছে। ভবিষ্যতে এগুলো একদিন প্রকাশ পেয়ে প্রমাণ করে দেবে মহা কুরআন অবশ্যই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থ।

কুরআন করীমের মু'জিযা

এ পর্যন্ত কুরআন করীম সম্বন্ধে আমরা যা আলোচনা করে এসেছি এর সবটাকেই কুরআন করীমের মু'জিযা বললে অত্যুক্তি হবে না। একটি বিষয় যা আমার মনে বেশি দাগ কেটেছে তা হলো কুরআনের আদর্শ ও শিক্ষার ফলে একটি জাতির ত্বরিৎ বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এটা বাস্তব এবং অনস্বীকার্য। কুরআন করীমের ঘোর বিরোধীও এটা অস্বীকার করতে সক্ষম হবে না। প্রাক ইসলামী যুগে আরবের লোকেরা ছিল বর্বর বেদুঈন এবং হিংস্র। সামান্য সামান্য ব্যাপারে তারা গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত এবং তা বছরের পর বছর ধরে চলতো। তারা একক কোন শাসকের অধীনে ছিল না। জোর যার মুল্লুক তার–এটাই ছিল তাদের নীতি। মানবিক মূল্যবোধ তো দূরের কথা নারীর কোন মূল্যই ছিল না তাদের কাছে–এ যুগকে বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ। এহেন এক জাতির মাঝে বিশ্ব নবী সারওয়ারে কায়নাৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিয়ে এলেন কুরআন করীমের মত এক মহা ঐশী গ্রন্থ। কুরআন করীমের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এ জংলী বর্বর মানুষগুলো সৃষ্টি করলেন এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কোন সময় অন্য সভ্যতার ধারক ও বাহকরা তাদের কাছে সভ্যতা সংস্কৃতি ভিক্ষা করেছে। তাদের মাঝে এ কুরআন এমন পরিবর্তন নিয়ে এলো যার ফলে সেই পশুতুল্য মানুষগুলো ওলী আল্লাহ্য় পরিণত হলো। যে তরবারী একদিন ভাইয়ের রক্ত প্রবাহিত করতো তা ভাইয়ের জীবন রক্ষার্থে ব্যবহৃত হতে থাকলো। এ প্রসঙ্গে অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দুনিয়াতে কোন ঐশী কিতাব এমন পরিবর্তন এত স্বল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র ১০ বছরে করে দেখিয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে এ প্রসঙ্গে আলোচনার ইতি টানতে চাচ্ছি ঃ

"কুরআন করীমের দ্বিতীয় প্রকারের মু'জিযা হচ্ছে সেসব মু'জিযা যেগুলোকে চাক্ষুষরূপেই প্রতীয়মান বলে অভিহিত করতে হয়। এগুলো হচ্ছে সেসব বিস্ময়কর ও অসাধারণ পরিবর্তন যা সংঘটিত হয়েছিল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মাঝে। এসবই সম্ভবপর হয়েছিল কুরআন করীমের প্রতি আনুগত্যের কারণে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বদৌলতে। আমরা যখন এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করি যে সেসব লোক ইসলাম গ্রহণের আগে কী রকম ছিল, কী রকম ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি, অভ্যাস আচরণই বা কিরূপ ছিল, আর পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে ও কুরআন করীমের প্রতি আনুগত্যের ফলে তাদের মাঝে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, কিভাবে তারা তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস, তাদের চরিত্র, চালচলন, কথাবার্তা, আচার ব্যবহার ও তাদের কাজকর্ম থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে পাক পবিত্র ও সুশৃঙ্খল জীবনে প্রবেশ করেছিল তখন এ অতি মহান প্রভাব, যা তাদের জরাজীর্ণ জীবনকে আশ্চর্য সজীবতা দান করেছিল, আলোকিত ও উৎফুল্ল করে তুলেছিল তা দেখে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয়, এ রূপান্তর এক অনন্য সাধারণ রূপান্তর এবং স্বয়ং খোদা তাআলার হাতেই সংঘটিত হয়েছিল।..... আর এ অসাধারণ আমূল পরিবর্তনকে বলতে হবে যে অবশ্যই এ ছিল এক মু'জিযা" (তসদীকুন্ নবী, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

বানা সাকতা নেহিঁ ইক পাওঁ কীড়ে কা
বাশার হারগিয
তো ফের কীউঁকার বানানা নূরে হাক্ব
কা উছপে আসাঁ হ্যা

(মানুষ কখনো কীটের একটি পা সৃষ্টি করতে পারে না
তবে কেমন করে সত্যের জ্যোতি সৃষ্টি করা তার পক্ষে সম্ভব ॥ দুর্‌রে সামীন)

(চলবে)

ইসলামে খিলাফত

মূল ঃ ফরিদ আহমদ (যুক্তরাজ্য)
অনুবাদ ঃ জামালউদ্দীন আহমদ সৌরভ

(৪র্থ কিস্তি)

তিনি আরো উল্লেখ করেন

'মহানবী (সা.) এর অনুসরণের দরুন আমি এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছি। যদি আমি তাঁর একজন অনুসারী না হতাম এবং তাঁর শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে পালন না করতাম, তাহলে পর্বত সমান ভাল কাজ করেও আল্লাহ্‌র সাথে কথপোকথনের সুযোগ লাভ করতে পারতাম না। কারণ কোন শরীয়তধারী নবী আর আসবে না, কিন্তু শরীয়তবিহীন নবী এখনো আগমন করতে পারে। কিন্তু তাকে অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর একজন উম্মত হতে হবে। সেই হিসেবে আমি একজন উম্মতী নবী। (তাযাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃঃ ২৪)

এই বক্তব্য মহানবী (সা.) এর সাথে তার সম্পর্ক এবং নবুওয়তের দাবী সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। এবং এই নবুওয়ত মহানবী (সা.) এর খিলাফতের এক দিক। প্রসঙ্গত এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে মহানবী (সা.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে তাঁর উম্মতকে কী দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

'.....তিনি (প্রতিশ্রুত মসীহ্) আমার পরে আমার উম্মতদের মধ্য হতে আমার খলীফা হবেন.....স্মরণ রাখ, যে কেউ তার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে, অবশ্যই তাকে আমার সালাম পৌঁছাবে।'

(আল-মো'জাম আল-আউসাত লিত-তাবারানী, মানিস্‌মুহু ইসা, আল-মো'জাম-উস-সগীর লিত-তাবারানী, মানিস্‌মুহু ইসা)

তিনি (সা.) আরো বলেন,

'যখন তোমরা মাহদীর সন্ধান লাভ করবে, তার হাতে বয়আত গ্রহণ করবে। যদি বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তবুও তার নিকট পৌঁছবে। তিনি মাহদী এবং আল্লাহ্‌র খলীফা।" (সুনান ইবনে মাজা, কিতাব উল ফিতাহ্, খন্ড, ২ পৃঃ ১৩৬৭)

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ঈসা (আ.) এর আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ। যেহেতু মূসায়ী মসীহ্ এবং তার উদ্দেশ্য যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে ঈসা (আ.) এসেছিলেন মূসায়ী শরীয়ত পূনরুজ্জীবিত করতে আর মসীহ্ (আ.) এসেছেন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে।

তিনি (আ.) বলেন,

'সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ্ এই অধমকে মনোনীত করেছেন মানবজাতির উৎকর্ষ সাধনে কাজ করার জন্য, যেমনটি ইসরাইলী নবীগণ করেছিলেন। যারা এখনো সঠিক পথের দিশা পায়নি, তাদের সঠিক পথে খোঁজ দেয়াই আমার কাজ, যেন তারা নাজাত লাভ করতে পারে এবং দুনিয়াতেই আখিরাতের জীবন লাভ করতে পারে। এবং আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহিত ও তাঁর ভালবাসা লাভ করতে পারে।'

(তবলিগী রিসালত, খন্ড ১ পৃঃ ১১)

তাঁর উদ্দেশ্যের স্বপক্ষে আরো প্রমাণ এই যে তাঁর মাধ্যমেই ঐশী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাআতের সদস্যদের উদাহরণ মহানবী (সা.) এর যুগের ইসলামের অনুরূপ। যেভাবে তিনি তাঁর অনুসারীদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রতিফলন। তিনি (আ.) বলেন,

'মহানবী (সা.) এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের ফলে হৃদয়ের যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তা এখন তোমাদের বলব, যেন রাখ এটিই হচ্ছে হৃদয়ের সঠিক অবস্থা। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা হৃদয় হতে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়, এবং এক অনাবিল প্রশান্তিতে এটি ভরে ওঠে। তখন এই ধার্মিক হৃদয়ের ফলশ্রুতিতে ঐশী ভালবাসা অর্জন করা যায়। এবং এই সব একমাত্র মহানবী (সা.) এর পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়ার ফলস্বরূপ। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২২, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫)

দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হওয়ার যে কথা তিনি বলেন তাতে কোন এক অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিদ্যমান। ইসলামের প্রাথমিক কালের খিলাফতের মত আধ্যাত্মিকতা এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করার চাবিকাঠি হচ্ছে এটি। প্রতিশ্রুত মসীহ্ যিনি খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে মনোনীত হয়েছেন, তিনি তাঁর অনুসারীদের সাবধান করেছেন এই বলে যে, তারা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে। এর মাধ্যমেই ধার্মিকতা অর্জন করা যাবে, দুনিয়ার লোভ লালসা ত্যাগ করেই ইসলামের প্রাথমিক কালের নৈতিকতা লাভ করা সম্ভব।

(চলবে)

[রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স্ অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যা]

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jammat
INTERNATIONAL

23 October 2008

REPORT

HEAD OF AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT MAKES HISTORIC ADDRESS AT HOUSES OF PARLIAMENT

Khilafat Centenary celebrations continue as UK Member of Parliament hosts celebratory event at Westminster

In an historic event at the Houses of Parliament, the Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad was yesterday invited to address a number of senior members of Government, Parliamentarians and Ambassadors as Justine Greening MP, hosted a reception in celebration of the Khilafat Centenary, which is the system of spiritual leadership that unites Ahmadi Muslims around the world.

The event was attended by over 30 MPs including Rt Hon Hazel Blears MP, Secretary of State for Communities & Local Government; Dominic Grieve MP, the Shadow Home Secretary; Simon Hughes MP, the President of the Liberal Democrats; Gillian Merron MP, the Foreign Office Minister and Lord Eric Avebury who gave the vote of thanks. The event was sponsored by Justine Greening MP, in whose constituency the first Ahmadi Mosque built in the UK, the 'Fazl Mosque', is based.

During her welcome address, Justine Greening MP, spoke of how the Fazl Mosque had played a key and vital role in the local community ever since it was built back in 1924. She said that it was indeed a privilege for her that the Headquarters of the Jamaat was based in her constituency. Her comments were echoed by Gillian Merron MP, the newly appointed Foreign Office Minister. She said it was a great honour to meet with the Head of the Jamaat and to be able to mark the Centenary of Khilafat. She said that the work of the Jamaat was crucial because it *'gave a voice to those who are marginalised'*. Commenting upon the continued persecution of Ahmadi Muslims in various countries she singled out Pakistan and Indonesia as countries where the situation appeared to be worsening. She said that the Foreign Office was committed to effecting the safeguarding of Human Rights in all countries.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, used his address to speak about a number of contemporary issues that were affecting the peace of society both in the UK and the world at large. He also spoke about the role of the Ahmadiyya Muslim Jamaat which he said was as the *'standard bearer and true representative of Islam'*. He said members of the Jamaat who lived in the UK were all completely loyal to the country because this was the teaching of the Founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him).

His Holiness began his address by speaking of the great conflict that divided the world today. Wars were being fought in different parts of the world. He worried of even greater problems. He said:

"It is my fear that in view of the direction in which things are moving today, the political and economic dynamics of the countries of the world may lead to world war... **Therefore, it is the duty of the superpowers to sit down and find a solution to save humanity from the brink of disaster."**

He said that the only way to avert further hostilities and disputes was for all Governments to act justly with their own people and in their dealings with other countries. He congratulated the British Government for having shown such qualities of fairness in its recent history. He cited its rule of pre-partition India as an example of its quality of fairness. Only if similar policies were adopted throughout the world could catastrophe be averted.

Turning towards 'terrorism' he said that no form of terror or violence was sanctioned in Islam and thus those who justified their heinous acts in its name were causing for the world to be distrustful and even hateful of the religion of Islam. As a consequence of this hate, certain non-Muslim groups or individuals had taken it upon themselves to attack Islam by defaming the character of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) and the Holy Qur'an. Such acts he stated could never be right and that a mutual respect for all religions and beliefs was necessary for true peace to emerge.

His Holiness then discussed crime in society. He said Islam's true teachings were to try and reform those who had done wrong. Revenge and retribution ought never to enter into the equation when debating the punishment of criminals or prisoners of war. Crime also had to be fought at its root cause which was the development of an unjust society. Thus countries had to be free to develop and cultivate their own natural resources without the fear of other more powerful nations exploiting them and this was just as true at an individual level. This was the way forward. He said:

"Those countries that have been endowed with mineral resources should be allowed to develop and trade at fair prices and under open skies and one country should benefit from the resources of the other country. So, this would be the right way, the way that is preferred by God Almighty."

Finally, His Holiness spoke of the current economic crisis that engulfed the entire world. He said the 'credit crunch' ought to be taken as a warning that the western system of interest based capitalism was wholly incompatible with a fair and just society. He said that though interest could appear to increase a person's capital, in the long term this was never true.

Following the keynote address of His Holiness various other MPs took to the stage. Hazel Blears MP spoke of how she had greatly admired the keynote address which she had found to be *'pertinent, contemporary and challenging'*. She said that the speech that had just been delivered was the type of speech that was rarely delivered by politicians because it was so cogent and clear to the point. The Jamaat's message of *'Love for All, Hatred for None'* was as important as it was simple because it was a message that led to unity rather than division. She further mentioned how she brought with her the best wishes of the Prime Minister, Gordon Brown who had personally sent her to attend the event.

A regular at events hosted by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Dominic Grieve MP, said he took great pleasure at finally being able to host the Jamaat. He praised the Jamaat for its *'wonderful contribution in all aspects of life'* which he said was due to its policy of integration rather than exclusion. He too said that he took great pride in the fact that the Headquarters of the Ahmadiyya Muslim Jamaat were in London. Simon Hughes MP said that the plight of the Jamaat in various countries illustrated the point that religious freedom had not yet been achieved and that the Government had to work towards bringing about such freedoms in all countries.

The event was concluded by a vote of thanks given by Lord Eric Avebury who spoke of how the keynote address had *'underlined the moral dimension that we must all follow'*. This His Holiness had done by speaking of both conflict prevention and conflict solution. Lord Avebury then spoke of the continued persecution of Ahmadis in Pakistan and said that organisations such as Khatme-Nabuwat perpetrated hatred against Ahmadis in such a way that people here in the UK could never understand. He concluded by thanking His Holiness for his *'wise words of wisdom'*.

Following the event Hadhrat Mirza Masroor Ahmad was given a guided tour of the Houses of Parliament and held private audiences with Nick Clegg MP, the Leader of the Liberal Democrats and Lord Bishop Nazir Ali.

খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালন অব্যাহত

হাউজ অব পার্লামেন্ট ভবণে যুক্তরাজ্যের সাংসদদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান

গতকাল (২২ অক্টোবর'০৮) নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্রদূতগণ ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিনিস্টার ভবনে আমন্ত্রন জানিয়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করেন। Justine Greening M P আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী আহমদীয়া মুসলিমদের একতার প্রতীক ও তাদের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে সংবর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

ইংলান্ডের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এতে হাউস অব পার্লামেন্টের ৩০ এরও অধিক সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এদের কয়েকজন হলেন - Rt Hon Hazel Blears MP, Secretary of State for Communities & Local Government; Dominic Grieve MP, the Shadow Home Secretary; Simon Hughes MP, the President of the Liberal Democrats; Gillian Merron MP; the Foriegn Office Minister.

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে Lord Eric Avebury ধন্যবাদ প্রস্তাব আনলে 'Vote of Thanks' প্রদান করা হয়। যুক্তরাজ্যের প্রথম আহমদী মসজিদ যা 'ফজল মসজিদ' নামে খ্যাত। এ মসজিদটি বৃটিশ M P Justine Greening এর নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির সার্বিক আয়োজন করেন Justine Greening M P.

Justine Greening M P তার স্বাগত বক্তব্যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষায় ১৯২৪ সনে নির্মিত হওয়ার পর থেকে এই 'ফযল মসজিদ' যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে তা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এটা তার জন্য আনন্দের বিষয় যে এ জামাআতের প্রধান কেন্দ্রগুলো তারই নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত। বৃটেনের নব-নিযুক্ত Foreign Office Minister – গিলিয়ন মেরন এম.পি-এর বক্তব্যেও সেই একই মন্তব্য প্রতিধ্বনিত হলো। তিনি বলেন-খিলাফত শতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক ক্ষণে এই জামাআতের মহান নেতা'র পবিত্র সাহচর্য্য লাভে তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছেন। এ জামাআতের কর্মসূচী কঠিন ও দুস্কর কেননা এরা প্রান্তিক সীমায় অবস্থানকারীদের পক্ষে সোচ্চার আওয়াজ তুলে থাকে।

বিভিন্ন দেশে আহমদী মুসলিমদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতন ও নিপীড়নের উল্লেখ করে তিনি পকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়াকে চিহ্নিত করে বলেন এ দুই দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তিনি আরও বলেন, পররাষ্ট্র দপ্তর সকল রাষ্ট্রে মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন ও নিবেদিত রয়েছে।

বেশ কটি সমকালীন সমস্যা যা বর্তমানে বৃটেন তথা গোটা বিশ্ব সমাজে শান্তি বিঘ্নিত করছে সে বিষয়ে আলোকপাত করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। সেই সাথে তিনি এক্ষেত্রে **'আহমদীয়া মুসলিম জামাআতকে ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী আদর্শ'** হিসাবে উল্লেখ করে এই জামাআত যে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বৃটেনে বসবাসকারী এই জামাআতের সদস্যরা দেশের আইনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করে থাকে কারণ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শ এটাই।

হুযূর (আই.) বর্তমান বিশ্ব যে মহাদ্বন্দ্বের কারণে বিভক্ত হয়ে রয়েছে তা উপস্থাপন করে বক্তব্য শুরু করেন। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ বিগ্রহ

সংঘটিত হচ্ছে। তিনি আরও কঠিনতর সমস্যার বিষয়ে ব্যাথিত হয়ে নিজ বক্তব্যে বলেন, 'যে দিকে আজ সমস্যাবলী অগ্রসর হচ্ছে তা দেখে আমার ভয় হয় বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত এই অবস্থা পরিণামে হয়তো বিশ্ব যুদ্ধ ডেকে আনবে...অতএব পরাশক্তিগুলোর দায়িত্ব হলো সম্মিলিতভাবে আলোচনায় বসা এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত বিশ্ব মানবতা রক্ষার সমাধান বের করা'

মতভেদ ও হিংসা বিদ্বেষ আরও ছড়িয়ে পড়া রুখতে সকল রাষ্ট্রের তাদের নিজ দেশের জনসাধারনের সাথে ন্যায় ও সমতা ভিত্তিক ব্যবহার করাই একমাত্র পথ এবং অন্যান্য দেশগুলোরও পারস্পরিক ন্যায় ও সমতা ভিত্তিক সম্পর্কই এই অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে। সমকালীন ইতিহাসে বৃটিশ সরকারের শিষ্টতাপূর্ণ মানের উল্লেখ করে তিনি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রশংসা করেন। ভারত বিভক্তির পূর্বে বৃটিশ সরকারের ন্যায় বিচারের নমুনা তুলে ধরে তিনি তার বক্তব্য দান করেন। শুধু মাত্র তদ্রুপ ন্যায়বিচার ভিত্তিক নীতিমালাই পারে বর্তমান বিশ্বে সর্বগ্রাসী এই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে।

সন্ত্রাসবাদের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইসলামে কোন ধরণের উগ্রতা ও সন্ত্রাসের অনুমতি নেই। অতএব যারা ইসলামের নামে আক্রমণাত্মক ও নাশকতামূলক কাজকে ন্যায় সংগত মনে করে তারা বিশ্বের জন্য হুমকি স্বরূপ এমনকি তারা ইসলামের মুখে কালিমা লেপন করছে। এইরূপ ঘৃণা উদ্রেককারী হিংসা বিদ্বেষের পরিনামে কোন কোন অমুসলিম দল বা ব্যক্তিরা ইসলামকে আক্রমন করতে মহানবী (সা.) এর চারিত্রিক মর্যাদা এবং কুরআন করীমের অবমাননা করার পথ নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে। এই ধরণের কাজ কোনক্রমেই সঠিক ও ন্যায় সংগত বলে বিবেচিত হতে পারে না বরং প্রকৃত শান্তির পথে অগ্রসর হতে এটা জরুরী যে, সকল ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে। এরপর হুযূর (আই.) সমাজে যে সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি (আই.) এ সম্পর্কে বলেন যারা ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের মধ্যে রয়েছে তাদের সংশোধনের চেষ্টাই হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। প্রতিশোধ ও প্রতিঘাত যুদ্ধবন্দী ও অপরাধীদের শাস্তিদানের বিতর্কের অবসান কখনই ঘটাতে পারে না। অপরাধের মূলে আঘাত করতে হবে, যা অস্থির ও অসম সমাজের বিস্তার ঘটায়। কাজেই সকল দেশেরই তাদের নিজ নিজ সম্পদের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও পরিচর্যার অবাধ সুযোগ থাকতে হবে যাতে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ ভয় ভীতি দেখিয়ে তাদের শোষণ না করতে পারে। এবং ব্যক্তি বিশেষের বেলায়ও এই একই নীতি প্রযোজ্য। অগ্রগতি লাভের পথ এটাই। তিনি (আই.) বলেন-'যেসব রাষ্ট্র খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী তাদের উন্নয়নে এবং ব্যবসা বানিজ্যে যথাযথ মূল্য প্রাপ্তির সুযোগ থাকতে হবে। এবং মুক্ত আকাশের নীচে অবাধে তারা তাদের উন্নয়নের কাজ ও ব্যবসা বাণিজ্য চালাবে। আবার এক দেশকে অপর দেশের সম্পদ থেকেও উপকার লাভের সুযোগ দিতে হবে। এটাই হচ্ছে সঠিক পথ যে সুযোগ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলা সকলের জন্য অবারিত করে রেখেছেন।

সব শেষে হুযূর (আই.) সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে বিরাজমান সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকটের উল্লেখ করে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি (আই.) আরও বলেন, পাশ্চাত্যের সুদ নির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'ঋনের ফাঁদ' একটি বিপদ সংকেত বিশেষ যা স্বচ্ছ ও ন্যয়নীতি ভিত্তিক এক সমাজ ব্যবস্থার সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। সুদ ব্যবস্থায় ব্যক্তির পুঁজি বাড়লেও শেষ পর্যন্ত তা সঠিক বলে সাব্যস্ত হয় না। হুযূর (আই.) এর মূল বক্তব্য উপস্থাপনের পর পার্লামেন্ট সদস্যগণ একে একে মঞ্চে এসে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন।

Rt Hon Hazel Blears MP, Secretary of State for Communities & Local Government তার কৃতজ্ঞতা সূচক বক্তব্যে হুযূর (আই.) এর ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি হুযূর (আই.) এর ভাষণকে 'প্রাসঙ্গিক, বিশ্লেষনাত্মক এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্নকারী বক্তব্য' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে কদাচিৎ অনুরূপ বক্তব্য রাজনীতিবীদরা দিয়ে থাকেন কারণ বক্তব্যটি ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং যথার্থ। **'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে'** জামাআতের এই বাণী সরল ও সংক্ষিপ্ত হলেও এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই বাণী বিভক্তির পরিবর্তে একতায় উজ্জীবিত করে। তিনি তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন – ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের শুভেচ্ছা বার্তা তিনি বয়ে নিয়ে এসেছেন এবং প্রধান মন্ত্রী একান্তভাবে তাকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পাঠিয়েছেন। পার্লামেন্ট সদস্য ডমিনিখ গ্রীভ বলেন তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন এবং জামাআতকে আজ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। 'জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান' রাখার জন্য তিনি জামাআতের প্রশংসা করেন। তার মতে এটা সম্ভব হয়েছে 'দূরে ঠেলে দেয়ার চেয়ে কাছে টানার নীতি' অবলম্বন করার কারণে। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের হেড কোয়ার্টার লন্ডনে অবস্থিত বলে অন্যদের ন্যায় তিনিও গর্ববোধ করেন বলে জানান। আরেক পার্লামেন্ট সদস্য সায়মন হাফ্স বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়ায় এ জামাআত কঠিনতর অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে এবং সরকারের উচিৎ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এদেশের ন্যায় ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসার ঘটানো।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে পার্লামেন্ট সদস্য Lord Eric Avebury হুযূর (আই.) এর মূল বক্তব্যের জন্য 'Vote of Thanks' প্রদান করেন এবং হুযূরের এই দিকদিশারী বক্তব্যকে 'সুমহান নৈতিকতাপূর্ণ দিকনির্দেশকারী যা আমাদের সকলের অবশ্য মেনে চলা উচিৎ' বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বক্তব্যে তিনি (আই.) দ্বন্দ সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহের সমাধান বাতলিয়েছেন। পাকিস্তানে আহমদীদের ধারাবাহিক নির্যাতন নিপীড়নের উল্লেখ করে তিনি বলেন খতমে নবুওয়তের মত সংগঠনগুলো হিংসা বিদ্বেষ এমনভাবে ছড়াচ্ছে যা বৃটেনবাসীদের ধারণাতীত। তিনি তাঁর (আই.) 'প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য' এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজ বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন।

অনুষ্ঠান শেষে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কে হাউজেজ অব পার্লামেন্ট ঘুরে দেখানো হয়। পরবর্তীতে পার্লামেন্ট সদস্য ও লিবারেল ডেমোক্রেট দলের প্রধান নিক ক্লেগ এবং লর্ড বিশপ নাযির আলী প্রমুখগণকে হুযূর (আই.) সৌজন্য সাক্ষাৎ দান করেন।

ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jammat
INTERNATIONAL

13 October 2008

PRESS RELEASE

MUSLIM EXTREMISTS CONTINUE PERSECUTION OF AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY IN INDONESIA

On 9th June 2008, the Indonesia Government, bowing to pressure from extreme and fanatical Muslim groups, hastily adopted a formal 'Joint Ministerial Decree' against the Ahmadiyya Muslim Jamaat (Community) in Indonesia. This Decree stated that members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat were to '*discontinue the promulgation of interpretation and activities*' of its beliefs which were branded as '*deviant*'. The Decree imposed sanctions on any members of the Jamaat who were found to be in breach of the Decree.

Most damningly the Decree gave State legitimacy to the persecution of the Jamaat in Indonesia which had been occurring for a number of years. As a result of this new found 'legitimacy' the persecution of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Indonesia has markedly intensified over the past few months.

Since the Decree was issued more than ten Ahmadiyya Mosques have been sealed and many more have been attacked. Furthermore, Ahmadi Muslims have been forced to offer prayers behind non-Ahmadi Imams. This is something that no Ahmadi Muslim could ever do willingly because to do so would be to perform prayers behind a person who did not believe in the truth of the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian.

This year the Ahmadiyya Muslim Jamaat is celebrating the one hundredth year of Khilafat, which is the system of spiritual leadership that unites the entire Jamaat at the hand of the 'Khalifa'. Unfortunately members of the Jamaat in Indonesia have been prohibited from celebrating this historic year. In one instance the logo marking the Khilafat Centenary celebrations was torn down in Pampangan by local leaders who could not bear the Ahmadiyya celebrations. In respect of this, Abid Khan, Press Secretary of the Ahmadiyya Muslim Jamaat said:

"Tearing down a logo may seem trivial, but it illustrates the true motives of the so called Muslims. They say they are defending Islam, yet they are willing to tear down a logo on which is printed a verse of the Holy Qur'an. The Holy Qur'an is the most sacred Islamic text and thus no true Muslim could ever bear seeing even one line of its text being ripped or torn. Such acts therefore demonstrate that these people are motivated only due to their hatred and jealously of the Ahmadiyya Muslim Jamaat."

A number of other incidents have been reported whereby Ahmadi Muslims have been subjected to various forms of persecution. This persecution has now reached a stage where the Ahmadis are even denied their basic civil rights. In one such example, in the south of Sumatera the Office of Religious Affairs continues to refuse issuing marriage certificates to Ahmadis until they sign a declaration abandoning their association to the Jamaat.

Despite widespread criticism both from the International Community and the International Media, the Indonesian Government shows no sign of withdrawing its Ministerial Decree. In this respect the International Community is urged to take note of the warning issued by Indonesia's former Head of State, President Abdur-Rahman Wahid who recently in an interview with the Reuters news agency said that if the persecution of the Ahmadiyya Muslim Jamaat was allowed to continue then it would lead to the persecution of other religions in the country. He said:

"The fundamentalists demand that the Ahmadiyya movement be disbanded. But I think it's only the first step. After they will make more demands. You ban Ahmadiyya, then you ban the Shiites, Christians, Buddhists."

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইন্দোনেশিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ওপর ইসলামী চরমপন্থী দলগুলোর নির্যাতন অব্যাহত

১৩ অক্টোবর ২০০৮

বিগত ৯ জুন ২০০৮ইং, উগ্র চরমপন্থী মুসলিম দলগুলোর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ইন্দোনেশিয়ান সরকার আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের (ইন্দোনেশিয়া) ওপর তড়িঘড়ি করে একটি রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী আদেশ জারি করে। এই আদেশ অনুযায়ী ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ধর্মবিশ্বাসকে "ভ্রান্ত" আখ্যায়িত করে জামাআতের সদস্যদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যাখ্যা ও প্রচারকার্য বন্ধ করতে বলা হয়। এই আইনের মাধ্যমে জামাআতের যে কোন সদস্যর দ্বারা উক্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য "শাস্তির" বিধান আরোপ করা হয়েছে।

সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয় হলো এই যে, এই রায়ের মাধ্যমে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ায় আহমদীয়া জামাআতের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া নির্যাতনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দেয়া হলো। নতুন এই "বৈধতা" পাওয়ার কারণে বিগত কয়েক মাসে ইন্দোনেশিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ওপর অত্যাচার লক্ষনীয়ভাবে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অধ্যাদেশ জারির পর থেকে দশটিরও বেশী আহমদী মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং আরো অনেক মসজিদে আক্রমণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, আহমদী মুসলমানদের জোরপূর্বক গয়ের আহমদী ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে বাধ্য করা হয়। এটা এমন এক কাজ যা কোন আহমদী মুসলমান স্বেচ্ছায় কখনোই করবে না কেননা এ কাজ করার অর্থ হলো, এমন এক ব্যক্তির পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা যে ব্যক্তি বিশ্ব আহমদীয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সত্যতাকে বিশ্বাস করেনি।

এই বছর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত খিলাফতের শতবার্ষিকী উদযাপন করছে, যা হলো "খলীফার" হাতে সমগ্র জামাআত একত্রিত করার এক আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ব্যবস্থা। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, ইন্দোনেশিয়ার আহমদী জামাআতের সদস্যদের এই মহান ঐতিহাসিক দিবসটি পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। Pampangan- এ এরূপ এক ঘটনায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আহমদীয়া জামাআতের এই মহান দিবস উদযাপন সহ্য করতে না পেরে 'খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী'র লোগো দুমড়ে মুচড়ে ছিড়ে ফেলে। এই বিষয়ে আহমদীয়া জামাআতের প্রেস সচিব আবিদ খান বলেন ঃ

"একটি লোগো ছিড়ে ফেলা খুবই তুচ্ছ ঘটনা হতে পারে কিন্তু এটা তথাকথিত এসব মুসলমানদের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, তারা বলে যে তারা ইসলামকে রক্ষা করছে কিন্তু হায়! সেই তারাই পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্বলিত একটি লোগো ছিড়ে ফেলছে। পবিত্র কুরআন হলো সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আর তাই কোন প্রকৃত মুসলমান-ই এই পবিত্র গ্রন্থের একটি আয়াত বা লাইনও ছিড়ে ফেলা সহ্য করতে পারে না। আর তাই এ ধরনের কাজ প্রমাণ করে যে, একমাত্র ঘৃণা ও ঈর্ষার কারণেই আহমদী জামাআতের বিরুদ্ধে তারা প্ররোচিত হচ্ছে।

এ ধরনের আরো অনেক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আহমদী মুসলমান বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেন। এ ধরনের নির্যাতন এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে আহমদী সদস্যদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ ধরনের একটি উদাহরণ হলো Sumatera -এর দক্ষিণে অবস্থিত ধর্ম বিষয়ক দপ্তর থেকে আহমদীয়া জামাআতের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর না করা পর্যন্ত আহমদী জামাআতের সদস্যদেরকে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোর ব্যাপক সমালোচনার পরও ইন্দোনেশিয়া সরকার তার এই কার্যনির্বাহী আদেশ তুলে নেয়ার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে, ইন্দোনেশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান ওয়াহিদ এর সতর্কবাণী আন্তর্জাতিক মহলের আমলে নেওয়া উচিত। সম্প্রতি রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আহমদী জামাআতের বিরুদ্ধে এরূপ নির্যাতন চলতে দেয়া হলে তা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপরও নির্যাতনের সূত্রপাত করবে। তিনি বলেন ঃ

"চরমপন্থীদের দাবি হলো আহমদী জামাআতের কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ। কিন্তু আমি মনে করি এটা কেবল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এরপর তারা আরো বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করবে। আহমদীদের নিষিদ্ধ করেছো তারপর তোমরা শিয়া, খ্রিষ্টান এবং বৌদ্ধদেরও নিষিদ্ধ করো।

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আহসান উজ্জামান

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Ahmadiyya Muslim Jammat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE 16 October 2008

FIRST AHMADI MOSQUE OPENED IN BERLIN

Head of Ahmadiyya Muslim Jamaat promises locals that there is *'no need to fear Ahmadiyya Mosque'*

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad today officially opened the Khadija Mosque in Berlin. The opening took place with great success as hundreds of local officials and neighbours came to attend the function. The entire event was broadcast live via MTA International throughout the world.

The opening of the Khadija Mosque marked the fulfilment of a desire of the Ahmadiyya Muslim Jamaat stretching back to the early 1920s when it was first proposed that an Ahmadi Mosque be built in the city of Berlin. The advent of the First World War put paid to the plans and thereafter until now the Jamaat was unable to build a Mosque in the city.

The building of the Khadija Mosque was not without incident. Since plans to build it were announced a number of groups had voiced their dissent fearing that its building would be a precursor to acts of terror or violence. In his address to the gathered audience, His Holiness, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad reassured the German people of the loyalty of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and explained the true purposes for erecting the Khadija Mosque. He said:

"This Mosque we have built has not been made for any Jihadi organisation or any terrorist activity but simply it has been built for the worship of Allah... From this Mosque of ours there will be no other call apart from love for humanity, affection, reconciliation, justice and peace. And you will observe that what I have said were not mere words but were acted upon. And time will, God willing, prove it to be so."

His Holiness further used the occasion to thank the German Government for providing a haven for persecuted Ahmadis who had been forced to flee Pakistan in fear of their lives. In this respect he applauded the Government for not only allowing such immigrants to live freely but for positively embracing them as part and parcel of the local society. He said that this warmth had been accepted by the Ahmadis who now took great pride in being German and who were all completely loyal to the State.

Developing his theme further, His Holiness rejected the fear voiced by segments of society that the building of the Mosque could lead to division between Muslims and non-Muslims. He said that in fact the opposite would be true. A prime example of the Jamaat's integration was that the President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat was an indigenous German. He said:

"His appointment is not based upon any political motive such as that a German should be made our President (Amir) or that we wish to receive any benefit from the German Government. It is merely due to his extreme sincerity, devotion and goodness that he has merited this status within the Community."

His Holiness concluded his address by stating that the protection and sanctity of all places of worship was a basic part of the Islamic faith. In this respect he told the audience of the extent to which all Ahmadis would go to observe this principle. Their loyalty did not end with the four walls of their Mosques. He said:

"If a Christian Church requires protection and an Ahmadi is called to help then he must help. If a Jewish Synagogue requires protection and an Ahmadi is called to help then he should be there. If a believer of any faith requires the help of an Ahmadi to establish justice then the Ahmadi should be there by his side."

The opening also included short speeches by Wolfgang Thierse, Vice Speaker of the German Parliament, Matthias Kohne, the local Mayor and Dr Heidi Knake-Werner, the State Minister for Integration. All three congratulated the Jamaat upon the opening of the Mosque and expressed their hope that it would become a beacon illustrating the peaceful co-existence of different segments of society in Berlin.

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বার্লিনে প্রথম আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ইমাম স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেন

'আহমদী মসজিদকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই'

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আজ (১৬ অক্টোবর '০৮) আনুষ্ঠানিকভাবে বার্লিনের খাদিজা মসজিদের উদ্বোধন করেন। অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শতাধিক স্থানীয় কর্মকর্তা ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি MTA ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

খাদিজা মসজিদের উদ্বোধন সেই কাঙ্খিত স্বপ্ন পূর্ণ করেছে যা ১৯২০ সালের শুরুতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের সম্প্রসারণে বার্লিন শহরে আহমদী মসজিদ নির্মাণের প্রথম প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাব এই পরিকল্পনাকে স্থগিত করে দেয় এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত জামাআত এই শহরে মসজিদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি।

খাদিজা মসজিদের নির্মাণ সহজেই হয়ে যায় নি। এটি তৈরীর পরিকল্পনা ঘোষণা থেকেই কয়েকটি দল আতঙ্কের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলছিল যে এই স্থাপনা সন্ত্রাস বা উগ্রতার অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা রাখবে। উপস্থিত শ্রোতাদেরকে হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ তাঁর বক্তৃতায় জার্মান সরকারের প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের আনুগত্যের বিষয়ে জার্মান জনগণকে আশ্বস্ত করেন এবং খাদিজা মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন–

"আমাদের নির্মিত এই মসজিদ কোন অস্তধারী সংগঠনের জন্য বা কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য তৈরী হয়নি বরং এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে.....। আমাদের এই মসজিদ থেকে মানবতার জন্য ভালবাসা, স্নেহ, বন্ধুত্ব স্থাপন, ন্যায় এবং শান্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আহ্বান করা হবে না। এবং আপনারা পর্যবেক্ষণ করবেন যে আমি যা বলেছি তা কেবল নিছক কথা নয় বরং কার্যকর করা হবে এবং সময় হলে খোদার ইচ্ছায় এভাবেই এটি প্রমাণিত হবে।"

নির্যাতিত আহমদী যারা নিজেদের জীবন সংকটাপন্ন হওয়ায় বাধ্য হয়ে পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য হুযূর (আই.) এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জার্মান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জার্মান সরকারের প্রশংসা করেন – অভিবাসীদের এমন উন্মুক্তভাবে শুধু বসবাসের অনুমতির জন্যই নয় বরং তাদেরকে স্থানীয় সমাজের প্রয়োজনীয় অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। তিনি বলেন, এই প্রাণবন্ত উচ্ছ্বলতা আহমদীদের দ্বারা স্বীকৃত যারা এখন জার্মানি হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত এবং এ জাতিসত্তার পরিচিতি দানে সম্পূর্ণরূপেই নিষ্ঠাবান।

মসজিদের এই স্থাপনা মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির কারণ হবে সমাজের এক শ্রেণীর দ্বারা উচ্চারিত এই আশংকা হুযূর (আই.) দূর করে দেন। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে বিপরীতটিই সত্য হবে। এখানে জামাআতের একীভূত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে এখানকার আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের আমীর একজন জার্মান ব্যক্তিই। তিনি (আই.) বলেন–

"তার নিয়োগ এমন কোন রাজনৈতিক ভিত্তির উপর হয়নি যে, প্রেসিডেন্ট (আমীর) একজন জার্মান হবে আর এভাবে জার্মান সরকার থেকে আমাদের কাঙ্খিত সুবিধাদি গ্রহণ করবো। এটি তার প্রতি প্রকৃতই উপযুক্ত যে তিনি শুধুমাত্র পরম আন্তরিকতা, ধার্মিকতা এবং সদগুণ-এর প্রশংসনীয় উৎকর্ষ দেখিয়ে জামাআতের এই পদমর্যাদার উপযুক্ত হয়েছেন।"

হুযূর তাঁর বক্তব্য এই বলে শেষ করেন যে, ইসলামী বিশ্বাসের একটি মৌলিক অংশ হলো ইবাদতের সকল স্থানের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা রক্ষা করা। এই বিষয়ে তিনি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত শ্রোতামন্ডলীর সকল আহমদীকে এই নীতিতে আমল করতে বলেন। তিনি বলেন–

"যদি একটি খ্রিষ্টান গির্জা রক্ষার প্রয়োজন হয় এবং একজন আহমদীকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয় তখন সে অবশ্যই সাহায্য করবে। যদি ইহুদীদের উপাসনালয়ের রক্ষার প্রয়োজন হয় এবং একজন আহমদীকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয় তখন সে অবশ্যই সেখানে যাবে। যে কোন ধর্মাবলম্বীর কারো যদি ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আহমদীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে আহমদীরা অবশ্যই তাদের পক্ষে সেখানে থাকবে।"

এছাড়াও উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন জার্মান সংসদের ডেপুটি স্পিকার Wolfgang Thierse, স্থানীয় মেয়র Matthias Kohne এবং State Minister for integration Dr. Heidi Knake Werner. এরা তিনজনই মসজিদের উদ্বোধনে জামাআতকে অভিনন্দন জানান এবং তাদের আশা ব্যক্ত করেন যে এটি বার্লিন সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শান্তি বিস্তারী আলোকবর্তিকা হয়ে সহাবস্থান করবে।

অনুবাদ ঃ তারেক আহমদ সবুজ

জ্ঞান জিজ্ঞাসা

এটি একটি সাধারণ প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা। প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন (মুরব্বী সিলসিলাহ্)। আর বিষয়টি অনুগ্রহপূর্বক দেখে দিয়েছেন মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ)।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত। কলেমা, নামায, রোযা ধনী দরিদ্র সবার জন্য বাধ্যতামূলক কিন্তু যাকাত ও হজ্জ ধনী ব্যতীত গরীবদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। আমার প্রশ্ন এই ধনী ব্যক্তিগণ হজ্জব্রত পালন করে তাদের নামের পূর্বে আলহাজ্জ বা হাজী লিখেন। কিন্তু যারা নামায পড়েন বা রোযা রাখেন তারা তাদের নামের সাথে নামাযী বা রোযাদার কেন লিখেন না? যুক্তিসংগত সমাধান কামনা করছি।

রকিব মাহমুদ চৌধুরী, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর ঃ হজ্জ করলেই নামের সাথে হাজী অথবা আলহাজ্জ লিখতে হবে বা বলতে হবে এমন কোন কথা নেই। রসূল (সা.) ও তাঁর খলীফাগণ এবং সাহাবাগণ হজ্জ করেছেন। কিন্তু তারা নামের সাথে হাজী বা আলহাজ্জ লিখেন নি। আর আমরাও বলি না। বলার প্রয়োজনীয়তা মনে করি না।

তবে এখানে একটি বিষয় স্মরণ যোগ্য তা হচ্ছে– হজ্জ এমন একটি ইবাদত যা প্রতিদিন করার নির্দেশ নেই। যাদের জন্য হজ্জ করা ফরজ (অর্থাৎ যাদের আর্থিক সামর্থ আছে, সুস্থ ও সবল এবং হজ্জ করতে যেতে রাস্তায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এবং তার জন্য মক্কায় যেতেও কোন নিষেধাজ্ঞা নেই) তারা জীবনে একবার হজ্জ করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু নামায ও রোযা নিয়মিত আদায়যোগ্য একটি ইবাদত। একবার আদায় করলেই শেষ নয়। মৃত্যুর আগে নামায অথবা রোযা ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে সে বেনামাযী ও বেরোযাদার হিসেবেই মারা যাবে। এছাড়া নামায ও রোযা নিয়মিত পালন যোগ্য একটি কর্ম। নিয়মিত আমরা যা করি সেটাকে কেউ বিশেষভাবে উল্লেখ করে না। তবে বিশেষ কাজ যা জীবনে একবারই করার সুযোগ আসে আর একবার করলেই তা পালন হয়ে যায়। তা মানুষ উল্লেখ করে। উদাহরণস্বরূপ যে একবার কুরআন মুখস্ত করে ফেলেছে তাকে আমরা হাফেজে কুরআন বলে থাকি।

প্রশ্ন ঃ গান এবং বাজনা সম্পর্কে শরীয়তের শিক্ষা কি?

ইফতি আহমদ জামিল, ঢাকা

উত্তর ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে শালিন ভদ্র দেশাত্মবোধক ও আধ্যাত্মিক গানে কোন সমস্যা নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনা আসেন। তখন তাঁকে (স.) বরণ করে নেবার সময় মদীনার মহিলারা স্বাগত জানিয়ে গান গেয়েছিল এবং সাথে 'দাফ' (ঢোল জাতীয় বাজনা) নামের এক ধরনের বাদ্যও বাজিয়ে ছিল।

এছাড়া আরও কিছু ঘটনা থেকে জানা যায় রসূল (সা.) ও তাঁর পবিত্র সহধর্মীনীগণ বিভিন্ন সময়ে মদীনার ছোট ছোট মেয়েদের গাওয়া বিশেষ ধরনের গান (বীরগাথা ও দেশাত্মবোধক গান) শুনেছেন।

এটা থেকে বুঝা যায় শালিন, মার্জিত, দেশাত্মবোধক গানে কোন সমস্যা নেই। তবে যে গান ও বাজনা অশালীন যা শ্রোতার মাঝে উন্মাদনা সৃষ্টি করে, শ্রোতার আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে নষ্ট করে, এ ধরনের গান শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেও বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব কি?

ফাহিম মিয়াজী-তারুয়া, বি. বাড়ীয়া

উত্তর ঃ হ্যা, আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা ইজতিহাদী (মানবীয়) ভুল হতে পারে যার সম্পর্ক দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বিষয়াদির সাথে। কিন্তু শরীয়তের বিধিনিষেধের বিষয়ে বা ঐশী বিষয়ের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আল্লাহ্র মনোনীত ব্যক্তিগণ ভুল করতে পারেন না। আর যদি কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তাঁদের এ ভুলকে বেশি সময় স্থায়ীত্ব দেন না। তাঁদের মৃত্যুর পূর্বেই এটাকে তাঁদের দ্বারা সংশোধন করিয়ে নেন।

প্রশ্ন ঃ এখরাজে নেযামের শাস্তিপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যাদের সাথে জামাআতের সাধারণ সদস্যদের কি আচরণ হওয়া উচিত?

শাহজাদা ইমরান হানিফ, ঢাকা

উত্তর ঃ কোন পরিবারের অভিভাবক/কর্তা ঐ পরিবারের কোন সদস্যকে শাস্তি দিলে তখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শাস্তিপ্রাপ্ত সদস্যের সাথে যে ব্যবহার করা উচিত অনুরূপ ব্যবহারই নেযামের শাস্তিপ্রাপ্তদের সাথে জামাআতের অন্যান্য সদস্যদের হওয়া উচিত।

খলীফা হচ্ছেন আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা। আমরা আহমদীরা তাঁর পরিবারের সদস্য। তাই খলীফা কাউকে শাস্তি দিলে তার ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা এতটুকু বুঝানো উচিত–"তুমি এমন কর্ম করেছ যাতে ঘরের কর্তা তোমার প্রতি মনোক্ষুন্ন হয়েছেন। তোমার এটা করা ঠিক হয়নি। তোমাকে অনুতপ্ত হওয়া উচিত। বার বার ক্ষমা চাওয়া উচিত।" আর এ বিষয়গুলো তাকে বুঝানোর জন্য, তাকে সংশোধন করার জন্য তার সাথে সহানুভূতি সূলভ একটা সম্পর্ক রাখা যাবে। তবে সাধারণ বিষয়াদী, অনুষ্ঠান এবং স্বাভাবিক মেলামেশা ও খোশ গল্পে তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। যাতে সে বুঝতে পারে, ঘরের কর্তা আমার প্রতি মনোক্ষুন্ন। তাই ঘরের অন্যান্য সদস্যরা আমার প্রতি স্বাভাবিক ব্যবহার করছে না।

প্রশ্ন ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, মৃত্যুর পরে চল্লিশা পালন করে না কেন? জামাআতের কোন সদস্য/ সদস্যা যদি তার আত্মীয়ের মৃত্যুতে চল্লিশা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তবে জামাআতের পক্ষ থেকে তার জন্য নসিহত কী?

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, চরসিন্দুর

উত্তর ঃ দেখুন, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের পরিপন্থী কোন কাজ করে না। রসূল করীম (সা.) করেন নি–এমন কোন কাজ করাটাও আমরা পছন্দ করি না। চল্লিশা, মৃত্যু বার্ষিকী বা এ জাতীয় যেসব অনুষ্ঠান রয়েছে এগুলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশাতে কখনো করেন নি। রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর (সা.) চল্লিশা বা কুলখানি বা এ জাতীয় কোন অনুষ্ঠান সাহাবাগণ (রা.) পালন করেন নি। এমনকি কোন খোলাফায়ে রাশেদা বা সাহাবীরও এমন কোন অনুষ্ঠান পালিত হয়নি। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করে দেখুন। তাই রসূল করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ যে কাজটি করেন নি সেটা করাকে আমরা বেদাত হিসেবেই দেখি। এজন্য আমরা চল্লিশা বা এ জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করি না।

তবে কোন আহমদী যদি না জানার কারণে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করে ফেলে তাহলে আমাদের করণীয় হলো তাকে জামাআতের শিক্ষা জানিয়ে দেয়া। দেখবেন, জানিয়ে দেয়ার পর সে অবশ্যই এটা আর করবে না।

আমাদের কাছে প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা ঃ

সম্পাদক

পাক্ষিক আহমদী
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, বাংলাদেশ।

ই-মেইল– pakkhik_ahmadi@yahoo.com

কবিতা

মোরা ইমাম মাহদীর দল

দুর্গম বাধার পথে,
ইমাম মাহদী করেছেন যাত্রা শুরু,
মোরা ইমাম মাহদীর রূহানী সন্তান
ইসলাম প্রচারে মোরা নইকো ভীরু।

কুরআন হাদীসের দলিল-প্রমাণ
রয়েছে মোদের সাথে,
স্রষ্টার তৌহীদ প্রচার করি মোরা
পূর্ণ ঈমানের সাথে।

হও আগোয়ান
আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত যত,
স্রষ্টার তৌহীদ প্রচার করব
মোরা অবিরত।

ভয় করি নাকো মোরা
পার হয়ে যেতে দুর্বার গিরি-দরি
মানি নাকো বাধা সোজা পথে চলি,
পাক কুরআন ও হাদীসের কথা বলি।

এসো সবাই মাহদীর পথে
সামিল হও নেক কাফেলাতে
জাগাও জগৎ দ্বীনের দাওয়াতে,
মাহদীর এ আহ্বান–শোন সবে কান পেতে।

–শাহ্ হকিব উদ্দীন

পিছন ফিরে দেখা

(পাক্ষিক আহমদী, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৮ থেকে)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর অমৃতবাণী

"অহংকার ও দুষ্কৃতি (শরারত) বড়ই মন্দ ব্যাপার। সামান্য একটি বিষয়ের দ্বারাই সত্তর বৎসরের আমল ব্যর্থ হইয়া যায়। লিখিত আছে যে, এক আবেদ (সাধক) ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাহাড়ে থাকিতেন। বহুদিন যাবত সেখানে বৃষ্টি হইতেছিল না। একদিন যখন বৃষ্টি হইল, তখন পাথর ও কঙ্করগুলির ওপরও বর্ষিত হইল, উহাতে তাঁহার মনে সংশয় ও আপত্তি জন্মাইল যে বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল ক্ষেতে খামারে ও বাগান সমূহে। এ কি ব্যাপার যে, উহা পাথরগুলির ওপর বর্ষিল? এই বৃষ্টি যদি ক্ষেত খামারে হইত, তাহা হইলে কত ভাল হইত। ইহাতে খোদা তাআলা তাঁহার সকল সাধনা ও বেলায়াত কাড়িয়া লইলেন। অবশেষে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অন্য এক বুজুর্গের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। পরিশেষে তাঁহার নিকট পয়গাম আসিল যে, তুমি আপত্তি কেন করিয়াছিলে? তোমার ঐ ভ্রমের জন্যই শাস্তি হইয়াছে।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৫০)

"অহংকার বিবিধ প্রকারের। কখনও ইহা চক্ষুর দ্বারা প্রকাশ পায়। যখন অন্যের প্রতি সে চোখ রাঙ্গাইয়া তাকায় তখন উহার অর্থ এই হয় যে সে অন্যকে তুচ্ছ মনে করে এবং নিজেকে বড় মনে করে। কখনও ইহা জবান বা মুখ দিয়া নিঃসৃত হয়। আর কখনও উহার প্রকাশ মাথা দ্বারা হইয়া থাকে এবং কখনও হাত এবং পায়ের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। মোট কথা, অহংকারের বহুবিধ উৎস রয়েছে। মু'মিনের উচিত, সেই যাবতীয় উৎস হইতে আত্মরক্ষা করা এবং তাহার কোনও অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেন এরূপ না হয়, যদ্বারা অহংকারের গন্ধ পাওয়া যায় এবং সে অহংকার প্রদর্শনকারী হয়। সূফীগণ বলেন যে, মানুষের মধ্যে নিচশ্রেণীর আখলাক বা প্রবৃত্তির বহু জিন রহিয়াছে এবং যখন সেইগুলি বাহির হইতে আরম্ভ করে তখন একটির পর আর একটি নির্গত হইতে থাকে। কিন্তু সর্বশেষটি হইয়া থাকে অহংকারের জিন এবং খোদা তাআলার ফযল ও অনুগ্রহ এবং মানুষের সত্যিকার মুজাহেদা (সাধনা) ও দোয়ার দ্বারাই উহা বহিষ্কৃত হয়।

বহু লোক আছে যাহারা নিজেকে বিনয়ী ও নিরহংকার মনে করে কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কোন না কোনও প্রকারের অহংকার (গুপ্ত) থাকে সেই জন্য অহংকারের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম প্রকার সমূহ হইতেও আত্মরক্ষা করা উচিত।

কোন সময় এই অহংকার ধনপ্রসূত হইয়া থাকে। বিত্তশালী অহংকারী অন্যকে কাংগাল মনে করে এবং বলে যে, 'সে কোন্ ব্যক্তি যে আমার মোকাবিলা করিতে পারে?' কোন কোন সময় খান্দান ও জাতের অহংকার হইয়া থাকে। সে মনে করে তাহার জাত বা বংশ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং অপর ব্যক্তি ছোট জাতের..... কোন সময় অহংকার এলম বা জ্ঞান হইতে আসিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ভুল শব্দ বলিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার দোষ ধরিয়া বসে এবং চেঁচাইয়া বলে যে, এই ব্যক্তি তো একটি শব্দও সঠিক বলিতে জানে না। মোট কথা, অহংকারের বিভিন্ন শ্রেণী প্রকার আছে। এই সবই মানুষকে নেকী ও পুণ্যলাভে বঞ্চিত করে এবং জনগণের উপকার করিতে বাধা দেয়। এই সকল হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষা এক প্রকারের মৃত্যুকে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মৃত্যুকে বরণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা তাআলার বরকত ও কল্যাণ মানুষ তাহার ওপর নাযেল হইতে পারে না এবং খোদা তাআলা তার তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক হইতে পারেন না।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪০)

ইলাহী জামা'তে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী ঃ

১। খিলাফত ও নেযামে খিলাফতের আনুগত্য ও এতায়াতের অভাব ও কমজোরী।

২। কুরআন মজীদ ও সিলসিলার কিতাবাদি বুঝে না পড়া।

৩। বাজামাত নামাযে শৈথিল্য।

৪। জুমুআর নামাযের প্রতি ঔদাসীন্য।

৫। নিয়মানুসারে রোযা পালন না করা।

৬। চাঁদার বাজেট লিখাতে আয় কম দেখানো এবং সহিভাবে চাঁদা না দেয়া বা বকেয়াদার ও নাদেহেন্দ হওয়া।

৭। ফেতনা করা।

৮। বুযুর্গানদের সম্বন্ধে কুধারণা রাখা, ছিদ্রান্বেষণ করা এবং গীবত করা।

৯। দীনের খেদমত করে প্রচারণা করা বা অহঙ্কার করা।

১০। আওলাদের সহি তরবীয়ত না করা।

১১। বিবাহ ব্যাপারে সিলসিলার আইন ও নিয়ম লঙ্ঘন।

১২। রসূমাতের গোলামী করা।

১৩। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ।

১৪। আপোষের লেনদেন পরিষ্কার না রাখা।

১৫। সিলসিলার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করতে অনীহা।

১৬। সিলসিলার উহ্দাদার ও কর্মীগণের কর্তব্যে অবহেলা।

১৭। ব্যক্তিগত ও পার্থিব স্বার্থ ও মতকে প্রাধান্য দেওয়া।

১৮। বেপর্দা ও অবাধ মেলামেশা।

১৯। মরকযের সাথে ঘনিষ্ঠ ও মহব্বতের সম্বন্ধ না রাখা।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলোর আনুপাতিক বর্তমানতা ব্যক্তি ও তার পরিবারকেও আনুপাতিক ভাবে আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও রহমত থেকে বঞ্চিত করে। ফলে পরিবার সহ সে জামা'ত থেকে দূরে সরে যায় এবং তার রূহানীয়ত হারিয়ে জামা'তের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তাআলা সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে আপন করুণায় রক্ষা করুন এবং তাদেরকে আপন ফযল ও রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন এবং জামা'তকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবমান রাখুন। আমীন।

মোহাম্মদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য

মাহমুদ আহমদ সুমন

ভ্রমণে স্বাস্থ্য সতর্কতা ঃ

ভ্রমণ কমবেশী সবার জন্যই আনন্দের। হোক তা দেশে কিংবা বিদেশে। তবে লক্ষ্য রাখা উচিত ভ্রমণটা যেন উপভোগ্য হয়। আর ভ্রমণকে উপভোগ্য করার অন্যতম উপায় হলো ভ্রমণকালীন সময়ে নিজেকে সুস্থ এবং সতেজ রাখা। সুস্থতা এবং সতেজতার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান এবং সতর্কতা। কেননা, সুস্থ না থাকলে ভ্রমণে খুব বিরক্তিকর লাগবে। তা ছাড়া ভ্রমণকালীন সময়ে স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় ঘটলে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। মোটর গাড়ীতে ভ্রমণের সময় অনেকেরই মাথা ব্যথা, বমি হওয়া কিংবা বমি বমি ভাব দেখা দেয়। আমাদের দেশে সাধারণত: মহিলা এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটা বেশি দেখা যায়। এই ধরণের অস্বস্থিকর অবস্থায় নিজের এবং সঙ্গীর উভয়েরই ভ্রমণ হয় অসহনীয়। এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। ভ্রমণে কখনো কখনো ছোট খাটো দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিছু কিছু ক্ষেতে সাবধানতা আবার কখনো কখনো এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থা সেসব দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে। ভ্রমণে নিম্নোল্লিখিত বিষয় সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

১। মোটর গাড়ীতে ভ্রমণকালে বমির ভাব হলে এটি এড়ানোর জন্য সামনের উইন্ডোক্লিন দিয়ে বাহিরের দৃশ্য দেখুন।

২। গাড়ীতে চলন্ত অবস্থায় বই, খবরের কাগজ কিংবা ম্যাগাজিন পড়বেন না। গাড়ীর ঝাকুনিতে বর্ণগুলোর ওপর চোখের ফোকাস স্থির থাকে না। ফলে চোখে খুব চাপ পড়ে। ফলে মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব এমনকি বমিও হয়।

৩। দিনের বেলায় অতিরিক্ত আলো এবং ধুলাবালি থেকে চোখ রক্ষায় সান গ্লাস ব্যবহার করুন।

৪। গর্ভবতী মহিলারা যতটা সম্ভব ভ্রমণ না করাই উত্তম। তবে ৪ থেকে ৬ মাস অন্তঃসত্ত্বাকালীন সময়ে ভ্রমণ করা যেতে পারে। ৬ মাসের পর ভ্রমণ অনেকটা ঝুকিপূর্ণ। কারণ এ সময় গর্ভপাত হতে পারে। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ভ্রমণকালীণ ব্যবস্থা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

৫। ভ্রমণের আগে কখনোই ভরপেট খাবেন না। বিশেষ করে চর্বি জাতীয় খাবার কোন মতেই নয়। ভ্রমণকালীন সময়ে হালকা নাস্তা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এ ছাড়া বিস্কুট, ফল কিংবা ফলের রস খাওয়া যেতে পারে।

৬। ভ্রমণকালীন সময়ে আদা কিংবা এ জাতীয় মসলা মুখে রাখলে বমি বমি ভাবটা দূর হয়ে যায়। আবার অনেকের লেবু কিংবা লেবু পাতার গন্ধ নিলে বমি ভাবটা দূর হয়। বমি ভাব এড়ানোর জন্য ভ্রমণের আগে সিনাবিজিন জাতীয় ট্যাবলেট ৩০মি. গ্রা. দুটি একত্রে খেয়ে নিতে পারেন। ৫-১০ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে এ মাত্রা অর্ধেক করতে হবে।

৭। ভ্রমণের সময় সঙ্গে অল্প বয়সের শিশু থাকলে তাকে কিছুটা হেলান দিয়ে শুইয়ে রাখুন। ভ্রমণকালীণ সময় শিশুকে যতটা সম্ভব কম খাবার দিন। শিশু যদি ঘুমাতে চায় তাহলে তাকে ঘুমাতে দিন।

৮। দীর্ঘ ভ্রমণে সিটে বসে পা দুটো যথাসম্ভব ছড়িয়ে বসুন। মাঝে মাঝে পা নাড়াচাড়া করবেন, যাতে রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা না হয়।

৯। ভ্রমণে সব সময় ঢিলেঢালা পোশাক ব্যবহার করুন।

১০। গাড়ীর ভেতর কখনই ধুমপান করা উচিত নয়। হাতের নাগালে বিশুদ্ধ পানির বোতল রাখুন এবং মাঝে মাঝে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিবেন।

১১। গাড়ী ড্রাইভ করলে এন্টি হিস্টাসিন জাতীয় ঔষধ বা অ্যালকোহল অবশ্যই বর্জনীয়।

১২। দীর্ঘ ভ্রমণে গাড়ীর সামনের দিকে বসার চেষ্টা করুন। কেননা, পেছনে ঝাঁকি বেশী লাগার ফলে বমি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১৩। আকাশ পথে ভ্রমণে বাতাসের চাপের তারতম্যের কারণে অনেকেই অস্থির কিংবা কানে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা অনুভব করে থাকে। এ থেকে রক্ষা পেতে নাক ও মুখ দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন এবং নিঃশ্বাস ছাড়ুন। এতে দেহের ভেতর এবং বাইরে বাতাসের তারতম্য দূর হয় এবং সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠে।

১৪। ভ্রমণের আগে নিজের রক্তের গ্রুপটা জেনে নিন। গর্ভবতী মহিলারা গর্ভাবস্থা সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র সঙ্গে রাখুন। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা তাদের নির্দিষ্ট ঔষধ অবশ্যই সঙ্গে রাখুন।

১৫। ভ্রমণকালীন সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়ক নিম্নোল্লিখিত জিনিসগুলো অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন–

এন্টিসেপ্টিক লোশন

গজ, ব্যান্ডেজ ও লিকোপ্লাষ্ট

কয়েক প্যাকেট খাবার স্যালাইন

জ্বর/ব্যথার জন্য এসপিরিন অথবা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট

এন্টাসিড জাতীয় ট্যাবলেট

বমির জন্য এভোমিন জাতীয় ঔষধ

সর্দি কাশি কিংবা এলার্জির জন্য হিস্টাসিন জাতীয় ঔষধ

পেটের পীড়ার জন্য মেট্রোনিডাজল জাতীয় ঔষধ এবং অ্যাজমা রোগীরা প্রয়োজনীয় ঔষধ নিতে ভুলবেন না।

একটি ফোল্ডিং হাত পাখা

ছোট একটি কাঁচি, পানির বোতল

পরিষ্কার বড় রুমাল

মোমবাতি-দিয়াশলাই বা একটি টর্চলাইট.....ইত্যাদি।

ভ্রমণ সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য–

দেশের বাইরে যেতে হলে প্রতিটি নাগরিককেই ভ্রমণ কর বা ট্রাভেল ট্যাক্স পরিশোধ করতে হয়।

ভ্রমণ কর যেভাবে দিতে হয় ?

নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় ব্যাংক চলাকালিন সময়ে ভ্রমণকর জমা দিয়ে রশিদ নিতে হয়। স্থলবন্দর, নৌবন্দর ও বিমানবন্দরের কাস্টমস ইমিগ্রেশন অতিক্রম করতে এ রশিদ দেখাতে হবে। এ কর বা ট্যাক্স দেশব্যাপী সোনালী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকের নির্ধারিত কিছু শাখায় এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থল সীমান্তের কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের দপ্তরগুলোর ব্যাংক বুথেও গ্রহণ করা হয়। তবে যাত্রার শুরুতেই নির্দিষ্ট ব্যাংকে নির্ধারিত পরিমাণ ভ্রমণকর দেয়া থাকলে, পরে হয়রানি হতে হয় না।

ভ্রমণ করের পরিমাণ ঃ

ভ্রমণ কর আইন ২০০৩ (৫নং আইন) ২০০৪ সালে ধার্যকৃত ভ্রমণ কর বা ট্রাভেল ট্যাক্সের পরিমাণ– স্থলপথে ৩০০/- টাকা। নৌপথে ৫০০/- টাকা এবং বিমানপথে (ক) সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য ৬০০/- টাকা। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ ও পথের জন্য বিভিন্ন হার রয়েছে।

ভ্রমণের আগে ও পরে করণীয় কিছু তথ্য ঃ

ভ্রমণের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা পয়সা সাথে রাখুন। আয় ব্যয়ের ভারসাম্য রাখতে সচেতন হোন। অপরিচিত জায়গায় ভ্রমণের জন্য গাইডের সাহায্য নেওয়াই ভাল। এ ব্যাপারে ট্যুর অপারেটর সাহায্য করতে পারবে আপনাকে।

গন্তব্যে পৌঁছে ঃ

স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা জানার চেষ্টা করুন।

হোটেল বুকিং দেয়া না থাকলে আবাসন নিশ্চিত করুন। নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখবেন।

সাধারণ খাবার বিশেষ করে পানির বিষয়ে মনযোগ দিন। ফুটানো বা বিশুদ্ধ পানি পান করুন।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঃ

পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, অলংকার, ব্যাংকের চেকবই বা নগদ টাকা পয়সয়া সাবধানে রাখুন। প্রয়োজন হলে হোটেলের লকার ব্যবহার করুন।

নির্জন এলাকা, সি-বিচ কিংবা জঙ্গলে একা ঘোরাফেরা করবেন না। বিপদ হতে পারে।

অপরিচিত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাই ভাল।

স্থানীয় আইনের প্রতি সচেতেন হোন।

পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু করবেন না।

ঢাকা কোলকাতা সরাসরি বাস ও ট্রেনের যাত্রার সময়-সূচী ঃ

ঢাকা–কোলকাতা–ঢাকা (এসি বাস সরাসরি যাতায়াত) ঃ

ঢাকা-কোলকাতা, বাসের নাম– বি. আর. টি. সি। এটি ঢাকা থেকে সপ্তাহে তিন দিন- সোম, বুধ, শুক্র। বাসের নাম– সৌহার্দ্য– এটি ঢাকা থেকে সপ্তাহে তিন দিন- মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি। ছাড়ার সময় সকাল ৭-০০টা এবং সকাল ৭-৩০ মিঃ। কোলকাতা পৌঁছার সময় সন্ধ্যা ৭-০০ টা থেকে ৭-৩০ মিঃ। ঢাকা যোগাযোগের ঠিকানা ঃ আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল, কমলাপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ০০৮৮-০২-৮৩৫৭৭৫৭ (বি. আর. টি. সি), ০০৮৮-০২-৮৩৫৬৭২০ (সৌহার্দ্য)।

কোলকাতা থেকে ঢাকা বাসে যাত্রা ঃ

কোলকাতা-ঢাকা, বাসের নাম বি. আর. টি. সি। এটি কোলকাতা থেকে ছাড়ে সপ্তাহে তিনদিন- মঙ্গল,বৃহস্পতি, শনি। বাসের নাম সৌহার্দ্য– এটি কোলকাতা থেকে সপ্তাহে তিন দিন- সোম, বুধ, শুক্র। কোলকাতা থেকে এই বাস ছাড়ার সময় সকাল ৭-০০ টা, ঢাকা পৌঁছার সময় সন্ধ্যা ৭-০০ টা। কোলকাতায় যোগাযোগের ঠিকানা ঃ করুনাময়ি আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল, সল্টলেক, কোলকাতা। ফোন ঃ ০০৯১-২৩৫৯৫৬৪৮ (বি. আর. টি. সি)। ০০৯১-৩৩-২৩৫৫৭১৬৬ (সৌহার্দ্য)।

কোলকাতা যাত্রা পথে ব্যবহৃত বর্ডারঃ

বাংলাদেশ বর্ডার, বেনাপোল। ভারতের বর্ডার, হরিদাশপুর। ভাড়া ঃ এক পথের ভাড়া–৭৫০/- টাকা। দুই পথের ভাড়া–১৫০০/- টাকা।

ঢাকা-কোলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচী ঃ

ঢাকা–কোলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ছাড়ার সময়, সপ্তাহে শনি ও রবিবার সকাল ৮-৩০ মিঃ। কোলকাতায় পৌঁছার সময় রাত ৯-০০ টা।

কোলকাতা থেকে ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় সপ্তাহে শনি ও রবিবার সকাল ৭-১০ মিঃ। ঢাকায় পৌঁছার সময় রাত ৮-৩০ মিঃ।

ট্রেনের ভাড়া ঃ

শোভন চেয়ার ৫৬০/- টাকা, ভ্রমণকর ৩০০/- টাকা। মোট টাকা ৮৬০/-। এসি চেয়ার স্নিগ্ধা–৮৪০/- টাকা ভ্রমণকর ৩০০/- টাকা, ভ্যাট ১২৬/- মোট ১২৬৬/- টাকা। এসি সিট-১৪০০/- টাকা, ভ্রমণকর ৩০০/- টাকা, ভ্যাট ২১০/– মোট ১৯১০/- টাকা।

বি: দ্র: * যে সকল যাত্রীর ভিসা দর্শনা গেটে রুটে নেয়া আছে তারাই কেবল মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেট ক্রয় করতে পারবেন।

* প্রতিদিন সকাল ৯-০০ টা থেকে বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত কমলাপুর ষ্টেশন থেকে টিকেট ক্রয় করা যাবে।

* প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতি যাত্রী বিনা মাসুলে ৩৫ কেজি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ২০ কেজি মালামাল বহন করতে পারবে। ৩৫ কেজির অতিরিক্ত ৫০ কেজির জন্য প্রতি কেজি ১৪০/- টাকা হারে এবং ৫০ কেজির অতিরিক্ত প্রতি কেজির জন্য ৭০০/– টাকা হারে মাসুল দিতে হবে।

সর্বশেষে কামনা করছি–আল্লাহ্ তাআলা ভ্রমণেচ্ছুদের ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও নিরাপদ করুন।

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

ডেস্ক নিউজ ঃ হোসনে মোবারক

তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

৫ আগষ্ট ২০০৬, ক্রোড়া।

গত ২৯/০৮/০২ইং রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব জনাব গাজী মাজহারুল খোকন (প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া)-এর সভাপতিত্বে এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব শামীম আহমদ ও জনাব আরিফুর রহমান রুমি কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন। বক্তৃতা রাখেন জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরী জনাব এনামুল হক ইন্টু (জি এস) যয়ীম ক্রোড়া জনাব ডা. খলীলুর রহমান ও জনাব মোজাম্মেল হক (মোয়াল্লেম ক্রোড়া)। সবশেষে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এবং দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

এনামুল হক ইন্টু

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত,
ক্রোড়া।

১২তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮, নাটোর।

রাজশাহী রিজিওনাল মজলিসের ১২তম ইজতেমা গত ১০ ও ১১ অক্টোবর তেবাড়িয়া নাটোরে অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩.১৫ মিনিটে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতারাম সদর আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক মোল্লা (যয়ীম তাহেরাবাদ মজলিস) নযম পাঠ করেন জনাব জয়নাল আবেদীন (নিউসোনাতলা)। আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনার পর সদর সাহেব ইজতেমার উদ্বোধনী করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এই রিজিয়নের মজলিসের কর্মকান্ডকে সক্রিয়া করার জন্য জোর তাগিদ দেন; বিশেষ করে চাঁদা আদায় এবং মাসিক রিপোর্ট নিয়মিত প্রেরণের অনুরোধ জানান। এরপর ভারপ্রাপ্ত কায়েদ উমুমী এবং কায়েদ তাজনীদ জনাব সারোয়ার মোর্সেদ সাংগঠনিক দিকের ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব শফিক আহমদ (যয়ীমে আলা ঢাকা-১), জনাব মহসীন আলী, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এবং প্রফেসার জনাব রাজীব উদ্দীন আহমদ (রিজিওনাল নাযেম) তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যা ৬ টায় হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শ্রবণের পর ইজতেমার বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান চলে। পরদিন তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল দ্রুত হাঁটা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, কুইজ প্রতিযোগিতা, লিখিত ও মৌখিক পরক্ষা, পয়গামী রেসানী এবং বালিশ খেলা। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় মুরব্বী খুরশিদ আলাম এবং রিজিওনাল নাযেম। সহযোগিতা করেন জেলা নাযেম আতাউর রহমান। ইজতেমায় তরবিয়তী মূলক বক্তব্য রাখেন রিজিওনাল নাযেম এবং স্থানীয় মুরব্বী। সমাপনি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করে রিজিওনাল নাযেম এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য জেলা নাযেমদ্বয় এবং চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি জনাব মঈন উদ্দীন আহমদ। ইজতেমায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের পর আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে এই মহতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রফেসর রাজীব উদ্দীন আহমদ

রিজিওনাল নাযেম

রাজশাহী রিজিওনাল মজলিস আনসারুল্লাহ্।

'বারাকাতুদ্ দোয়া' পুস্তকের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮, খুলনা।

গত ১৭/১০/০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসরুল্লাহ্, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) রচিত 'বারকাতুত্ দোয়া' পুস্তকের উপর এক আলোচনা সভা খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। নায়েব যয়ীম আলা জনাব নাসীর উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী এবং আহাদ পাঠ করেন খুলনা জেলার জেলা নাযেম জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অতঃপর 'বারকাতুত্ দোয়া' পুস্তকের উপর আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ নুরুল্লাহ্, জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী, জনাব মঞ্জুরুল আলম, জনাব শেখ

আলী আকবর, জনাব এস. এম. আনসার উদ্দীন, জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অতঃপর সভপতি সাহেব সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ করেন। সভায় মোট উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক

মুহাম্মদ শামসুর রহমান

যয়ীম-ই-আলা

মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনা।

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জামাআতের উদ্যোগে রমযানে তালীমী ক্লাসের আয়োজন

খুলনা ঃ রমযান মাসে ৪ টি তালিমী ক্লাস আয়োজন করা হয়েছে। ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি উৎসাহব্যঞ্জক। মোট ১৫ লাজনা বোন কুরআন খতম করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। এ ছাড়া ৫ জন অর্থসহ কুরআন খতম করেন।

রংপুর ঃ ২৩/৮ ও ২৭/৮ এই দুইদিন তালিমী ক্লাসের আয়োজন করে রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্, প্রথম দিনে ওসীয়্যতের গুরুত্ব, খাতামান্নাবীঈন বিষয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা, রমযানের কল্যাণ, রমযানে ইতিকাফ কেন পালন করা হয়। এই বিষয়গুলোর ওপর ক্লাস হয়। ২য় দিন 'মিনহজুত্তালেবীন পুস্তকের' আলোকে তরবিয়তের ওপর , পাপ কি, পুণ্য কি পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ও প্রতিকার', 'মানুষের দোষ ত্রুটি কিভাবে অবহিত হওয়া যায় এগুলোর আধ্যাত্মিক চিকিৎসা', 'কুরআন ও জীবন' গ্রন্থ থেকে আলোচনা হয়। এছাড়া কুরআন শিক্ষার উপর ক্লাস হয়। ক্লাসে ১৫ জন লাজনা, ৪ জন নাসেরাত, ১ জন মেহমান এবং ৩ জন আতফাল অংশ নেন।

তেজগাঁ ঃ রমযান উপলক্ষে তালিমী ক্লাস করেছে তেজগাঁ। সভাগুলোতে কুরআনের দরস, নামাযের গুরুত্ব ও সত্যবাদিতা, রোযার কল্যাণ ও কুরআন পাঠের আয়োজন করা হয়, ৫, ১২ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ক্লাসগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঃ প্রতিটি হালকায় রমযান মাসে নিয়মিত কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুরআনের দরসও দেয়া হয়েছে ক্লাসগুলোতে। এ ক্লাসে বি. বাড়িয়া মজলিসের ৫টি হালকায় কুরআন খতমকারীর সংখ্যা মোট ১৭১ জন (আলহামদুলিল্লাহ্)। প্রতি দিন ৫টি হালকা মিলে গড়ে ৫৬ জন তারাবী নামায পড়েছেন।

মিরপুর ঃ রমযান উপলক্ষে ১৯/৯ তারিখে তালিমী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। ২১ জন লাজনা ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন, ক্লাসে রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব ও কল্যাণ, রমযানের ইতেকাফ কেন পালন করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ ঃ রমযান মাসে প্রতিটি হালকায় তালীমী ক্লাস হয়েছে। ক্লাসগুলোতে রমযানের কল্যাণ, রমযানে কুরআন পাঠ, তাহাজ্জুদ ও নফল আদায় এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সেক্রেটারী তালিম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ।

শুভ বিবাহ

• গত ১০/১০/০৮ইং মোছাঃ মালিহা বেগম (পুতুল), পিতা-মোহাম্মদ মনওয়ারুল হক, মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর এর সাথে মোহাম্মদ মেহেদী বারী পিতা-ডা. মোহাম্মদ আব্দু বারী সরকার, মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর এর বিবাহ ১০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৩৮/০৮

• গত ৮/১০/০৮ইং ফাহিমা আহমদ সীমা, পিতা-মোহাম্মদ সুরুজ মিয়া, ভাদুঘর, পূর্ব পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে সৈয়াদ নাজিব আহমদ (স্বপন) পিতা সৈয়দ জালালা উদ্দীন, মধ্য পাড়া, তারুয়া বি. বাড়ীয়ার বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৩৮/০৮

রিসতানাতা দপ্তর

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।

কৃতি ছাত্রী

আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবাণী, হুযূর (আই.) এবং জামাআতের সকলের দোয়ার কল্যাণে আমাদের মেয়ে আমাতুল হাফিজ H.S.C-(০৮)তে A+অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছে। সে S.S.C-(০৬)তেও A+ লাভ করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাকে জামাআতের মুখ উজ্জ্বল করার মত সফলতা লাভের সৌভাগ্য দান করেন এজন্য সকলের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মাহমুদ আহমদ শরীফ

মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

এ পক্ষে কৃষিতে করণীয় ঃ

১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর
১৭ কার্তিক থেকে ১ অগ্রহায়ন

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এখনও আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। এ খাতে সবচেয়ে বেশী লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। কৃষির মূলে রয়েছে আমাদের দেশের কৃষক ভাইয়েরা। কৃষক ভাইদের সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর তাদের খামারের লাভ ক্ষতি নির্ভর করছে। চাষী ভাই এপক্ষে করণীয় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

১) আমন ঃ এপক্ষে আমন ব্যাপকভাবে কাটা শুরু হবে। ফসল শতকরা ৮০% ভাগ পাকলেই কেটে ফেলবেন। মনে রাখবেন এর চেয়ে বেশী পাকলে ফসলের মান ও ফলন দুই কমে যায়।

চাষী ভাই নিজের প্রয়োজনীয় বীজ নিজে রাখুন। যে প্লট থেকে বীজ রাখবেন সে প্লটের ফসল অবশ্যই রোগমুক্ত হতে হবে। রোগাক্রান্ত প্লট থেকে বীজ রাখবেন না। বীজ প্লট কাটার পূর্বে আর একবার বিজাত বাছাই করুন।

দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইরা আমন ফসলে আর উপরি প্রয়োগ করবেন না। কার্তিক মাসে যে সকল জাত পাকে তা রৌদ্র উজ্জল দিবসে কেটে ফেলুন। এ ছাড়া এ মৌসুমে সামুদ্রিক ঝড়ের আশঙ্কা থাকে তাই শতকরা ৮০% ভাগ পাকলে কেটে নিরাপদ স্থানে মজুদ করুন।

২) ভুট্টা চাষ ঃ আমন কাটার পর মাঝারি উঁচু জমিতে ভুট্টা চাষ করতে পারেন। মনে রাখবেন, রবি মৌসুমের ভুট্টা চাষ এ পক্ষকাল পর্যন্ত করা যাবে। খড়া দেখা দিলে সেচের ব্যবস্থা করবেন।

জমিতে ভাল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখবেন। মনে রাখবেন এ পক্ষেও মাঝে মাঝে ভারি বর্ষণ হতে পারে। বৃষ্টির পরপরই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবেন। ভুট্টার কা- মাটির উপর না উঠা পর্যন্ত জলাবদ্ধতা হতে দেয়া যাবে না।

চাষী ভাই, ভূট্টার সাথে সাথী ফসল হিসাবে লাল শাক, ঢাক-১ জাতের চিনাবাদাম চাষ করতে পারেন।

ফুল ফোঁটা এবং দানা বাধার সময় জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখতে হবে।

৩) আগাম আঁখ চাষ ঃ এ পক্ষকালেও আগাম আঁখ চাষ করতে পারেন। প্রত্যেক ফসলের ক্ষেত্রে রোগমুক্ত সুস্থ সবল বীজ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। তাই রোগ মুক্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। বীজ রোপনের পূর্বে শোধন করে দিন। এ ব্যাপারে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করতে পারেন।

জমি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে

আঁখ চাষের সাথে সাথী ফসল হিসাবে মসুর ডাল চাষ করতে পারেন।

৪) ডাল জাতীয় ফসল ঃ এ পক্ষ হলো রবি মৌসুমের ডাল যেমন : মসুর, ছোলা, ফেলুন, মটর, খেসারী ইত্যাদি চাষের উত্তম সময়। আমন কাটার পর পরই আপনি এ সকল ফসল চাষ করতে পারেন।

৫) তেল জাতীয় ফসল ঃ এ পক্ষকাল পর্যন্ত সরিষা চাষ করতে পারেন। যে সকল জমিতে আমন কাটার পর বোরো চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন সেসকল জমিতে টরি-৭ অবশ্যই বোরন সার ব্যবহার করুন।

৬। রোরো চাষ : চাষী ভাই, এ পক্ষকালে রোরো বীজ তলা করুন। বীজতলা পর্যায়ক্রমে অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। তাই চারার বয়স বেশী হয়ে যায়। বেশী বয়সের চারা রোপন করলে ফলন ভাল হয় না।

বোরন সার কেন ব্যবহার করবেন?

চাষী ভাইদের নিকট থেকে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, অধিক সার ব্যবহার করার পরও দিন দিন জমির ফলন কমে যাচ্ছে। উদ্ভিদের জীবনচক্র (জন্ম থেকে পুর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত) সম্পন্ন করতে যে সকল পদার্থ দরকার হয় সে সকল পদার্থকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলা হয়। এ সব পদার্থের যে কোন একটি অভাবে গাছ জীবনচক্র সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। অন্য যে কোন বিকল্প পদার্থ দিয়ে ও তা পূরণ করা যায় না বলেই জমির ফলন কমে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ১৮টি পদার্থকে গাছের পুষ্টি উৎপাদন হিসাবে শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে গাছের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি পদার্থ বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে এদেরকে মুখ্য উপাদান এবং বাকী সব পদার্থকে গৌণ উপাদান বলা হয়। গৌণ উপাদান পরিমাণে কম হলেও উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। **বোরন এমনই একটি গৌন উপাদান।** বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন,

বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, যশোর, ঢাকা জেলার (নিম্নাঞ্চল বাদে) এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার (নিম্নাঞ্চল এবং মধুপুর গড়ের লাল মাটি এলাকা বাদে) মাটিতে বোরন সারের ঘাটতি রয়েছে। এ সকল জেলায় বোরন সারের অভাবে গম, সরিষা, ছোলা সহ সকল উদ্যান জাতীয় ফসলের ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যাচ্ছে।

বোরন ঘাটতি কোন ফসলে পরিলক্ষিত হচ্ছে :

এসব অঞ্চলের যে সকল ফসল উৎপাদনে এই গৌণ উৎপাদনটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে সেগুলো হচ্ছে ঃ–

(১) গম, (২) সরিষা, (৩) ছোলা, (৪) পেঁপে, (৫) ফুলকপি, (৬) বাঁধা কপি, (৭) টমেটো, (৮) ব্রোকলি, (৯) গোল আলু, (১০) বাদাম (১১) সূর্যমুখি।

বোরন এর অভাবে কি পরিমাণ ফলন হ্রাস পাচ্ছে ঃ–

গবেষণায় দেখা গেছে যে উপরোক্ত ফসলে বোরন ব্যবহার না করলে নিম্নোক্ত হারে ফলন হ্রাস পায় :

গম = ১৫% – ৪৮%

সরিষা = ৪১% – ৫৯%

ছোলা = ৫৯%

ফুলকপি = ৬০%

বাঁধাকপি = ১০%

টমেটো = ৮%

ব্রকলি = ৯%

গোল আলু = ৮%

বাদাম = ৯%

বোরন ঘাটতির লক্ষণ : –

গাছের অগ্রভাগের পাতা কুকড়ে যায়, মোটা ও খাটো হয় এবং মরে যায়।

ফুলের কুড়ি বিকৃত হয়ে মারা যায়।

কান্ড ফেটে যায়, কালো দাগ পরে।

গাছে বীজ ধরে না।

শিকড়ের বৃদ্ধি মন্থর এবং খাটো হয়।

গাছ মচমচে ভাব ধারণ করে।

ফুল বন্ধা হয়।

বোরন প্রয়োগের উপকারিতা :–

বোরন গাছের কোষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বোরন প্রয়োগে ফুলের রেণু সবল ও সুস্থ থাকে।

ফুলের বন্ধাত্ব দূর হয় এবং চিটা রোধে সহায়তা করে।

সঠিক মাত্রায় বোরন প্রয়োগে ফসলের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং ফসলের বাজার দর বেড়ে যায়।

সর্বোপরি বোরণ ব্যবহারে ফলন বেড়ে যায়।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

সরিষা, গম, ছোলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, গোল আলু, বাদাম এর জমিতে প্রতি বিঘায় ১(এক) কেজি বোরিক এসিড জমি তৈরীর শেষ চাষে অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

সূর্যমুখীর জমিতে বিঘাপ্রতি ১.৫০ কেজি বোরিক এসিড জমি তৈরীর শেষ চাষে অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

পেঁপে চাষের জমিতে বিঘা প্রতি ১.৫০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপনের পূর্বে গর্ত তৈরীর সময় ৭৫০ গ্রাম এবং উপরি প্রয়োগ হিসাবে ফলন্ত গাছে মার্চ মাসে ৩৭৫ গ্রাম এবং অবশিষ্ট ৩৭৫ গ্রাম সেপ্টেম্বর মাসে অন্যান্য সারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে হালকাভাবে কুপিয়ে গাছের চতুপার্শ্বে প্রয়োগ করতে হবে।

উপরি প্রয়োগের জন্য ২.৫০ গ্রাম থেকে ৩.০০ (তিন) গ্রাম বোরিক এসিড ১(এক) লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে বোরন সরাসরি গাছের পাতায়, শিকড়, ফলে প্রয়োগ করা যায় না। এছাড়া বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে গাছ মরে যেতে পারে।

বোরন সারের বিষ ক্রিয়া ঃ

এ গৌণ সারের অভাবে ফলন যেমন কমে যায় তেমনি মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। ফলন কমে যায়। অনেক সময় একেবারেই ফলন হয় না। বোরন সারের বিষক্রিয়ার ফলে খাদ্য শস্যে ও দানার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। গাছের ডগার পাতা কুকড়িয়ে যায়। পাতায় রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাই মাত্রাতিরিক্ত বোরন সার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য কৃষক ভাইদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

চাষী ভাই সুষম মাত্রায় বোরন সার ব্যবহার করুন। অধিক ফলন ফলান।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়াত
আহমদীয়া মুসলিম
জামাআত,বাংলাদেশ

হুযূর (আই.) এর সাথে করমর্দন করছেন বৃটেনের পার্লামেন্ট সদস্য ও লিবারেল ডেমোক্রেট দলের নেতা নিক ক্লেগ

হুযূর (আই.) কে সংবর্ধনা দানকারী বৃটেনের পার্লামেন্ট সদস্য জাস্টিন গ্রিনিং ওয়েস্ট মিনিস্টার ভবন ঘুরে দেখাচ্ছেন

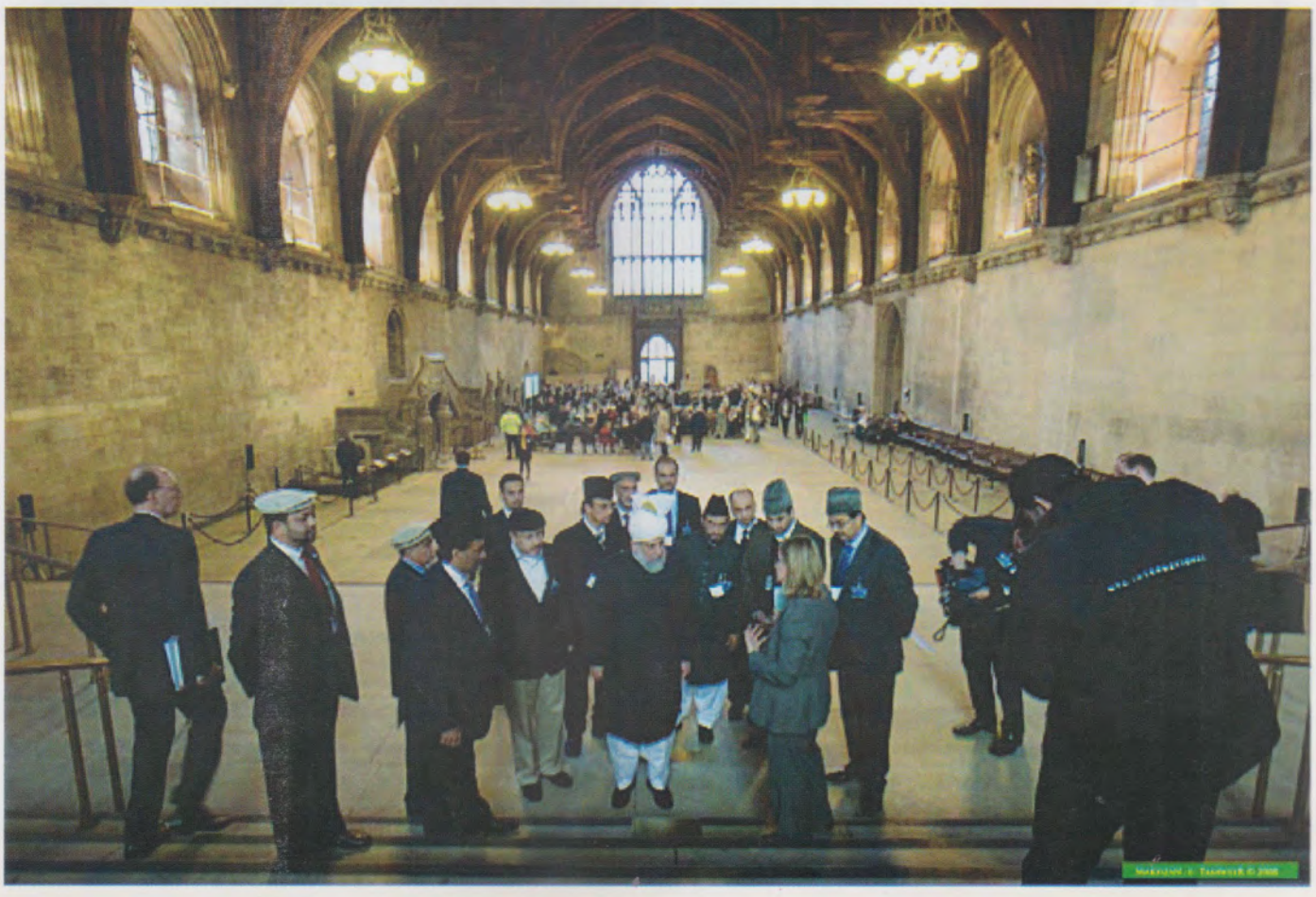

ধানসিড়ি
১০০% খাঁটি সরিষার তৈল

ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈলের গুণাবলী

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নতমানের সরিষা থেকে ঘানিতে প্রস্তুতকৃত ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈল। ফুডগ্রেড পি ই টি বোতলে বাজারজাত করা হয়। ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈল কোলেস্টেরলমুক্ত তাই এটি স্বাস্থ্যকর।

খাঁটি গাওয়া ঘি
ধানসিড়ি

ধানসিড়ি খাঁটি গাওয়া ঘি-এর গুনাবলী

গরুর দুধের টাটকা ক্রীম দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী। পোলাও, বিরিয়ানী, কোরমা, হালুয়া বা যে কোন সুস্বাদু খাদ্য তৈরীতে ধানসিড়ি গাওয়া ঘি অতুলনীয়।

ধানসিড়ি
রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি
খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printig

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz

Specialist in Making Metal Crest, Trophy, Medal, Silver/Gold Coated Dish Model, Coat Pin, Key Ring, Plastic Sign, Poly Sign, Wooden & SS Febrication

A Home of Quality Crest Trophy & Gift Items

DHAKA HEAD OFFICE
H - 79, Block # H / 11 (1st Floor), Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com